ছোটদের সেরা মাসিকপত্র

সন্দেশ

জুলাই

২০০৪

পোস্টার : তৃতীয় প্রচ্ছদে

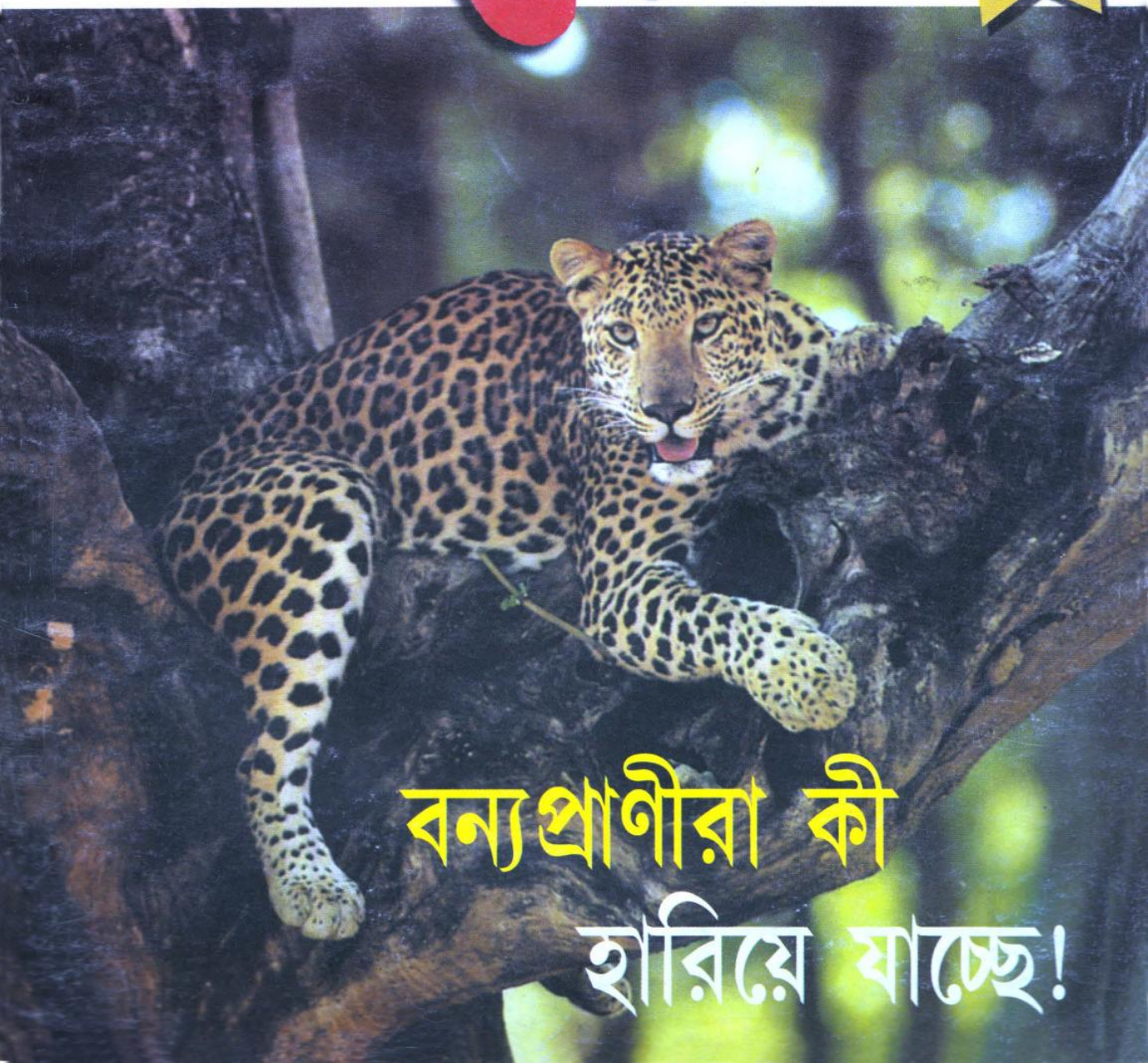

বন্যপ্রাণীরা কী হারিয়ে যাচ্ছে!

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি, স্ক্যান এবং এডিটিং - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোন পুরনো পত্রিকার কোন সংখ্যা থাকে এবং
আপনি যদি আমাদের এই অভিযানে সঙ্গী হতে চান তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

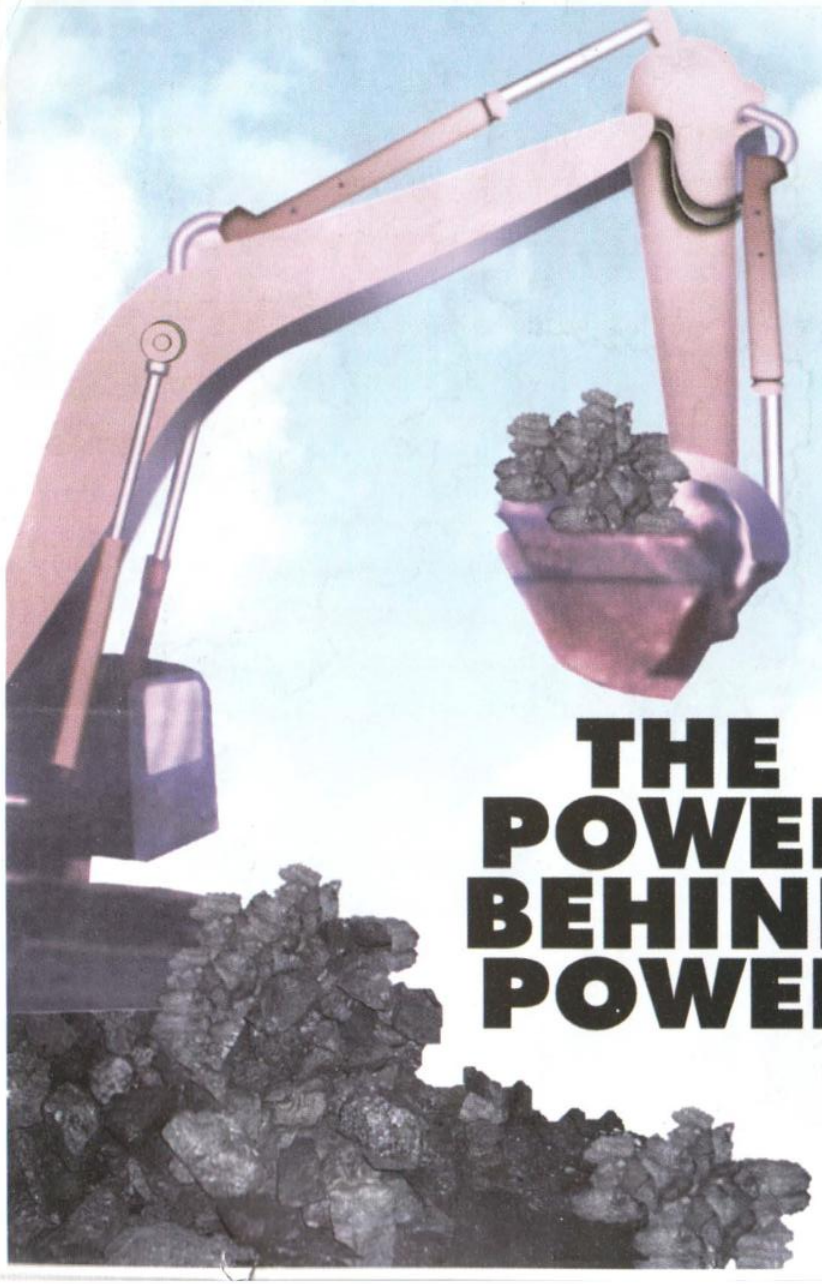

THE POWER BEHIND POWER

Many diverse activities... one successful philosophy

Added a new dimension in mining of coal and other minerals.

The success of the EMTA Group may be attributed to its philosophy that is based on professional management practices, regular upgradation of skills and knowledge and an unvarying commitment to customer satisfaction. A successful philosophy indeed...

The EMTA Group

The Essence of Power

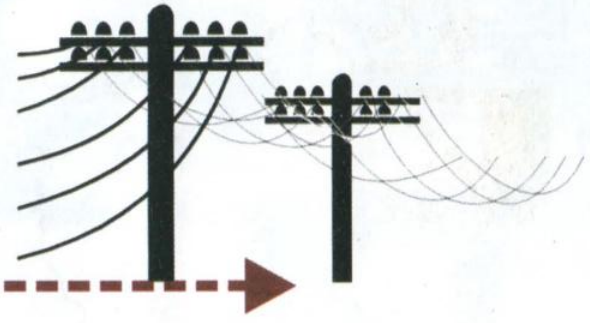

EMTA GROUP OF COMPANIES

105, Central Plaza, 2/6, Sarat Bose Road, Kolkata - 700 020
Ph : 2475 9891, Fax : (91) (33) 2474 9695
E-mail : emta@cal2.vsnl.net.in

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত ● ছোটদের সেরা মাসিকপত্র

তৃতীয় পর্যায় ● বর্ষ ৪৩ ● জুলাই ২০০৪ ● আষাঢ় ১৪১১

বিশেষ আকর্ষণ

বন্যপ্রাণীরা কী হারিয়ে যাচ্ছে! : প্রসাদরঞ্জন রায় ২৮
বন্যপ্রাণীদের সভ্যতা : সব্যসাচী চক্রবর্তী ৩৬
চিত্রনাট্য : জয় বাবা ফেলুনাথ (ধারাবাহিক) ৪০
সন্দেশ পোস্টার ৭২

পুরোনো সন্দেশ থেকে

সেলাই-বাক্স : কল্যাণ চক্রবর্তী ২১

ধারাবাহিক উপন্যাস

যমুনাবতী : রাজা রায় ১৫

গল্প

মহারাজের বাঘ শিকার : অরুণিমা রায়চৌধুরী ৪
দুই গুনিন এক দুশমন : কুমার মিত্র ৭
মেট্রোর নাম মোবিয়াস : রাজর্ষি রায়চৌধুরী ৫২

কবিতা

জামাই-শ্বশুর কিস্‌কা কসুর? : ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ৩
লাগালাগি : কিরণময় গঙ্গোপাধ্যায় ২২
অন্নদাশঙ্কর : রেবন্ত গোস্বামী ২২
চিঠি : সৃজন পাল ২৩
আমার ঘর : রমিতা পাল সেনগুপ্ত ২৩

প্রবন্ধ

হাতিদের দূরভাষ : গোপাল ভট্টাচার্য ৫৬
বিধানি নিদান : নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৯

কার্টুন

রান্নাঘরের গল্প : সর্বজিৎ সেন ১৩

কমিক্স

কমান্ডার বোস : গৌতম কর্মকার (ধারাবাহিক) ২৪
নন্দ গুপীর মন্দ কপাল : দিলীপ দাস ৬০

খেলা

ইউরো কাপ, অঁরি দেলানি এবং অঘটন! সুমন বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২
এভারেস্ট, বাঙালি এবং সত্যব্রত : বল বয় ৬৪

বিভাগীয়

পাঁচ কথার প্যাঁচ : শুভেন্দু দাশমুন্সী ৪৭
অঙ্কের মজা : স্বপ্নাভ রায়চৌধুরী ৪৯
শব্দ-সন্ধান : বর্ণবণিক ৪৯
জানো কি? ৫০
প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর : জীবন সর্দার ৬৫
শব্দজব্দ : স্নেহাশিস কুমার ৭০
ধাঁধা ৭১

হাত পাকাবার আসর ৬৭

লেখা : শঙ্খশুভ্র মল্লিক, দিৎসা উপাধ্যায়, শ্রীজিতা পাল, রিখিয়া ভুক্ত

সম্পাদক
সন্দীপ রায়

যুগ্ম সম্পাদক
সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসাদরঞ্জন রায়

নির্বাহী সম্পাদক : সুমিতা সামন্ত

শিল্পনির্দেশনা : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

বিশেষ সহায়তায় : দেবাশিস সেন

সন্দেশ কার্যালয় ১৭২/৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কলকাতা ২৯ থেকে সন্দীপ রায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৯৪/২/১ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড (ফেডারেশন হল তৃতীয় তল), কলকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত
স্বত্বাধিকারী : সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি লিমিটেড

জানার কোনো শেষ নাই...

দেখছি যত, শিখছি তত,
দেখার শেখার শেষ তো নাই ;
বিশ্বভ্রমণ সহজ এখন,
বোতাম টিপে বিদেশ যাই!
অঙ্ক ভূগোল লাগছে সরল,
ইতিহাসটা কাহিনী ;
অ্যাটম নিয়ে খেলতে গিয়ে
হয়ে গেলাম বিজ্ঞানী!
সবজান্তা এ যন্ত্রটা
ভুলিয়ে দিল সব চিন্তা
রয়েছে আলো, চলছে ভালো
নতুন যুগের কলকাতা!!!

Radiant 04-05

CESC
LIMITED
আলো আছে,
কলকাতা ভালো আছে

জামাই-শ্বশুর কিস্‌কা কসুর?

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

শ্বশুরবাড়ি যেই না জামাই
হাজির হলেন ভোরে,
কেঁদেই শ্বশুর বললে, আমার
সব নিয়েছে চোরে!
তোমায় এখন যত্ন-আত্তি
করব কেমন করে?
সেই চিন্তায় শুকিয়ে আমি
যাচ্ছি জামাই মরে।

মুচকি হেসে একটু কেশে
বললে জামাই জোরে,
দিচ্ছি অভয়, মন থেকে ভয়
ভাবনা যাবেই সরে!
অনেক কষ্টে পেলাম ছুটি
ম্যানেজারকে ধরে,
দিন-পঁচিশেক একটু না হয়
থাকব কষ্ট করে!

ছবি : অনিন্দ্য বসু

মহারাজের বাঘ শিকার

তরুণিমা রায়চৌধুরী

মহারাজ ভূপ সিং মহা ভাবনায় পড়েছেন। তাঁর রাজ্যের পশ্চিম সীমানা জুড়ে যে বিশাল বিস্তৃত বনটি রয়েছে, সেখানে নাকি কিছুদিন যাবৎ একটা বাঘ ঘোরাফেরা করছে। মনে হয় বেশ কয়েক ক্রোশ গেলে বনটা যেখানে আরও গভীর হয়েছে সেখান থেকে ছটকে চলে এসেছে বাঘটা। কয়েকজন কাঠুরে তাকে দেখেই ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিয়েছে রাজসভায়।

'হুঁ।' মহারাজ চিন্তিতমুখে বললেন 'কাউকে নিয়ে-টিয়ে যায়নি তো? জখম-টখম করেছে কি কাউকে?'

মহামন্ত্রী বললেন, 'না মহারাজ, আপনার ওই বনে এত হরিণ, বরা, খরগোস আছে, — মানুষ মারতে যাবে কোন দুঃখে?'

'ওঃ। তবে আর এত ভয়ের কী?'

একজন কাঠুরে হাতজোড় করে বলল, 'মহারাজ, এখনও মারেনি। কিন্তু মারতে কতক্ষণ? হিংস্র জন্তুর কোনও বিশ্বাস আছে?'

'হিংস্র জন্তু?' মহারাজ একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। 'হ্যাঁ মহারাজ।' কাঠুরেরা সমস্বরে বলল, 'ওই বনে এখন আমরা কী করে কাঠ কাটতে যাই?'

'হুঁ', রাজামশাই মন্ত্রীকে বললেন, 'কান্‌হাইয়ালালকে খবর দিন।'

কান্‌হাইয়ালাল এ রাজ্যের সেরা শিকারি। কী বন্দুক, কী তীরধনুক - সবেতেই তার টিপ একদম পাক্কা। সঙ্গে সঙ্গে খবর গেল তার কাছে। কান্‌হাইয়ালাল তখন তার গোরুমোষের পাল মাঠে ছেড়ে দিয়ে একটা বটগাছের ছায়ায় বসে বাঁশি বাজাচ্ছে। রাজার সেপাই ছুটে গিয়ে তাকে বলল, 'চল্ চল্ শিগগির। রাজামশাই ডেকেছেন। বাঁশি-টাশি এখন রাখ্।'

'কী ব্যাপার?'

'বাঘ মারতে হবে।'

'বাঘ এল কোত্থেকে?'

'সে আমরা কী জানি? এখন চল্ শিগগির।'

কী আর করে? কানহাইয়ালাল বাঁশি রেখে উঠল। ছোট ভাই লছমনকে ডেকে গোরুগুলো তার জিম্মা করে দিয়ে হাজির হল রাজসভায়। রাজামশাই তাকে দেখেই বললেন, 'এসেছ কান্‌হাইয়া? এদিকে দ্যাখো কী বিপদ্। কাঠুরেরা জঙ্গলে যেতে ভয় পাচ্ছে। বলছে বাঘ বেরিয়েছে নাকি।'

কান্‌হাইয়ালাল হাত জোড় করে বলল, 'আপনি তলব করেছেন মহারাজ, না এসে পারি? কিন্তু আপনার মতো তীরন্দাজ, কী বন্দুকবাজ তো আমি নই।

ভূপ সিং বললেন, 'আমি তো আর বন্দুক ছুঁই না, তীরধনুকও না। সেজন্যই তোমাকে ডেকে পাঠালাম।'

'কান্‌হাইয়ালাল বলল, 'জানি মহারাজ। আপনি শিকার খেলা ছেড়ে দিলেন তো আমিও বন্দুক তুলে রাখলাম। শিকার-খেলা আমার কোনোদিনই ভালো লাগত না। শুধু আপনার হুকুমে আপনার সঙ্গে যেতাম।'

মহারাজ ভূপ সিং সত্যিই মস্তবড়ো শিকারি। অল্পবয়েসে অনেক শিকার করেছেন। অনেক উঁচুতে উড়ন্ত বুনোহাঁস এক গুলিতে ফেলে দিয়েছেন। এ বনে তখন বাগ-টাঘ ছিল না। বন মুরগি, বুনো-হাঁস, বরা, হরিণ অনেক মেরেছেন।

একবার ছোট্ট রাজপুত্র চৈত সিংকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন হাতির পিঠে চড়িয়ে; 'চল্ বেটা, শিকার— খেলা শিখতে হবে না? নইলে আর কেমন রাজপুত্তর?'

বনের ভেতর ঢুকেই একটা হরিণ দেখে ছুঁড়লেন গুলি। ব্যাস্, এক গুলিতেই খতম। হরিণটা তখনও মাটিতে পড়ে ছটফট করছে— রাজামশাই রাজকুমারের মুখের দিকে তাকালেন, 'দেখলি মুন্না? এক গুলিতেই— বলেই থেমে গেলেন। কারণ, দেখলেন রাজপুত্তুরের ঠোঁট কাঁপছে থরথর্ করে, দুগাল বেয়ে চোখের জল

গড়াচ্ছে। চৈত সিং জলভরা চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, মারলে কেন? 'রাজামশাই-এর হাত থেকে বন্দুকটা খসে পড়ল। কান্হাইয়ালাল সঙ্গে ছিল ভাগ্যিস, চট্ করে ধরে ফেলল।

রাজপুত্র আবার বলল, 'মারলে কেন বাবা?'

মহারাজ কী উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না। তাঁর মনে হল — মাটিতে ছট্ফট করতে করতে রক্তাক্ত হরিণটাও যেন বলছে, মারলে কেন? বনের গাছপালা, আকাশ-বাতাস, ঘাস-মাটি — সবাই যেন বলছে, মারলে কেন? মারলে কেন? মারলে কেন?

রাজামশাই দুহাত বাড়িয়ে ছেলেকে আঁকড়ে ধরলেন। কান্হাইয়ালাল মাহুতকে তাড়া দিয়ে বলল, 'জলদি ফিরে চল্।' প্রাসাদে ফিরে এসে রাজা রাজপুত্তুরকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

মহারানি ভয় পেয়ে বললেন, 'কী হয়েছে?' রাজকুমার তখনও বালিশে মুখ গুঁজে সমানে বলে চলেছে— 'মারলে কেন? মারলে কেন?'

মহারাজের তলব পেয়ে কবিরাজমশাই যখন ছুটে এলেন, তখন তার গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। মুখে তখনও সেই কথা, 'মারলে কেন?' প্রায় দুমাস ধরে চলল যমে-মানুষে টানাটানি। তারপর আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠল রাজপুত্র। রাজা-রানির মুখে হাসি ফুটল। প্রজারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

আরও একজন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সে কান্হাইয়ালাল। তার আর এখন বন্দুক কী তীরধুনক নিয়ে মহারাজের সঙ্গে বনে- জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হবে না। কারণ, রাজামশাই আর বন্দুক তুলে নিলেন না। শুধু তাই নয়, মাংস খাওয়াই ছেড়ে দিলেন তিনি।

অনেকদিন পর সেসব পুরোনো কথা মনে পড়ল। রাজামশাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'উপায় নেই কান্হাইয়ালাল, এবার তোমার বন্দুক নামাতে হবে। প্রজারা ভয় পাচ্ছে।'

কান্হাইয়ালাল বলল, 'নামাব মহারাজ। আপনি যখন হুকুম করছেন, তুলে রাখা বন্দুক আবার নামাব।'

পরদিন অন্ধকার থাকতেই ভোরে ভোরে বেরিয়ে পড়লেন দুজনে। পায়ে হেঁটেই চললেন। কান্হাইয়ার হাতে বন্দুক। মহারাজ চলেছেন খালি হাতে। অনেকদিন পর এলেন। বহু নতুন নতুন গাছপালা গজিয়েছে। কাঠবেড়ালিরা তুরতুর করে ডালে ডালে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁদের দুজনকে দেখে কয়েকটা বাঁদর গাছের উঁচু ডাল থেকে কিচির মিচির করে কী সব বলল। দু-একটা হরিণও চোখে পড়ল। কিন্তু কোথায় বাঘ? — দূর বাঘ-টাঘ নেই। মহারাজ বললেন, 'চলো ফিরি।

কান্হাইয়ালাল হঠাৎ বলল 'দাঁড়ান মহারাজ, — গন্ধ পাচ্ছেন না?

'গন্ধ?' মহারাজ দাঁড়িয়ে পড়ে নাক টানলেন 'হ্যাঁ পাচ্ছি।'

'কীসের গন্ধ?'

বাঘের গায়ের গন্ধ। এখানেই ধারে কাছে কোথাও আছে। কানহাইয়ালাল বলল, নীচে থাকা আর নিরাপদ নয়। আসুন এই গাছটায় উঠে পড়ি।

মহারাজ পাকা শিকারি ছিলেন। গাছে-টাছেও বহু চড়েছেন আগে। তাঁর বিশেষ অসুবিধে হল না। গাছে

উঠে দুজনেই একটা উঁচু ডালে বসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বাঘ খুঁজতে লাগলেন। হঠাৎ কান্হাইয়ালাল বন্দুক তুলে নিল। মহারাজ বললেন 'দেখতে পেলে?'

কান্‌হাইয়া চোখের ইশারায় দেখিয়ে বলল, 'ওই।'

মহারাজ সেদিকে ফিরেই আস্তে কান্‌হাইয়ার হাতের বন্দুক নামিয়ে দিলেন।

'মারব না মহারাজ?'

রাজামশাই ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে বললেন, 'চুপ!'

একটু দূরে একটা ঝোপের আড়ালে আধশোয়া হয়ে

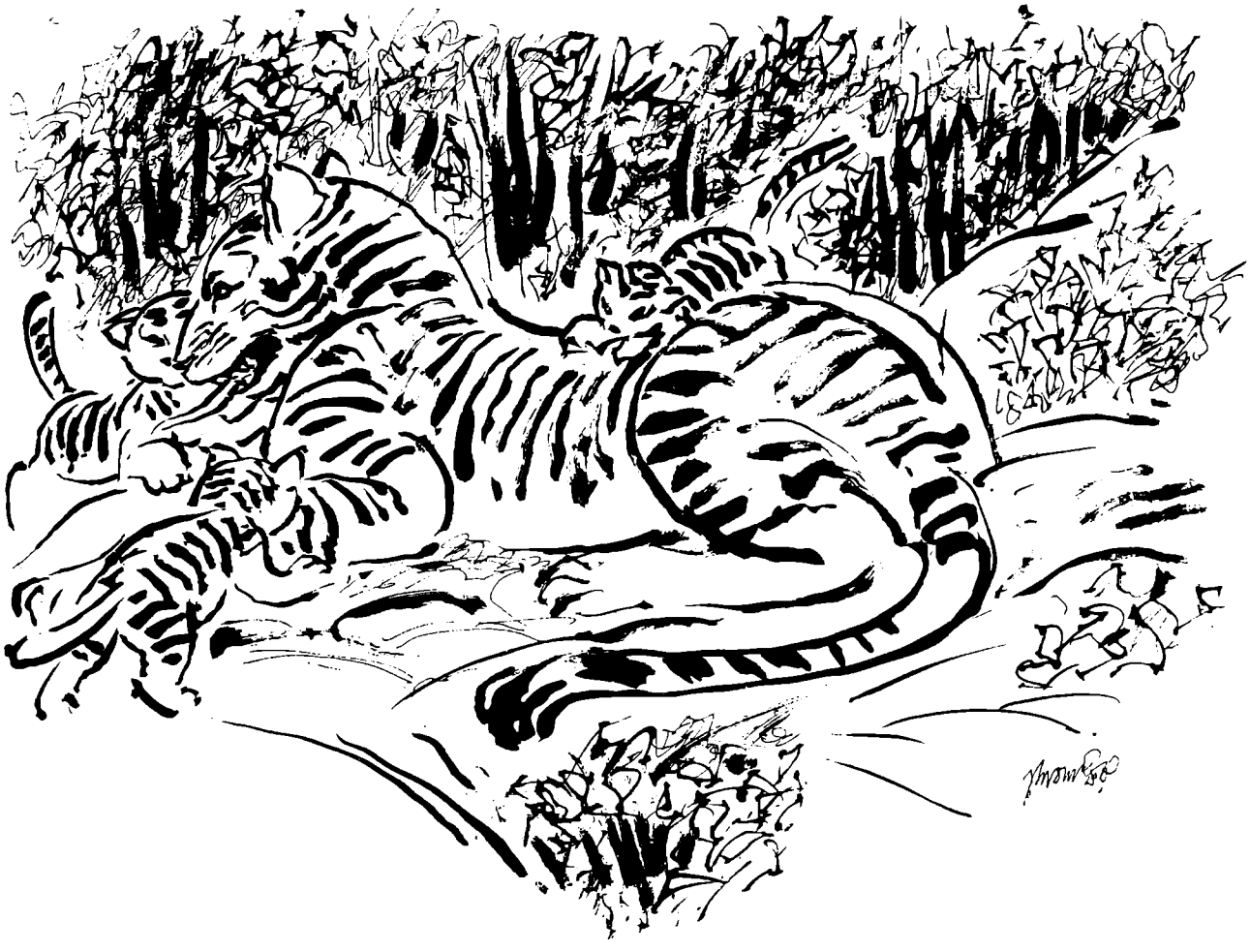

মাথা তুলে আছে এক বিশাল বাঘিনি। অনেক উঁচু ডালে বসে আছেন বলেই ওঁরা দেখতে পাচ্ছেন তাকে। বাঘিনির পাশে তিনটে ছানা এ ওর ঘাড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলছে। মাঝে মাঝে লাফিয়ে মায়ের গায়ের ওপর উঠছে। বাঘিনি মাও কাছে পেলেই চেটে চেটে আদর করছে ওদের। দুজনে মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়েই বোধহয় ছানা তিনটে মার কোল ঘেঁষে এল তারপর তার পেটের মধ্যে মুখ গুঁজে দুধ খেতে লাগল। তাদের মা-ও পরম নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে শুয়ে রইল। মহারাজ চুপি চুপি বললেন,'চলো এবার নামা যাক।'

কান্‌হাইয়ালাল বলল, 'বাঘটা?', 'বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছে খাওয়াক না।'

দুজনে সাবধানে নিঃশব্দে গাছ থেকে নামলেন। ফিরে যেতে যেতে মহারাজ বললেন, 'কাঠুরেদের কী বলব তাই ভাবছি।'

কানহাইয়ালাল বলল, 'ভাববেন না মহারাজ, আপনার পাইক-পেয়াদাদের বলবেন— ওরা সবাই মিলে ঢোল, কাঁসি, ক্যানেস্তারা নিয়ে আচ্ছা করে বাজালেই বাঘিনি-মা বিরক্ত হয়ে ছানা-পোনা নিয়ে দূরের জঙ্গল পালাবে।'

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

দুই গুনিন এক দুশমন

ঢ্যাঙা সিড়িঙ্গে কালোপানা চেহারার লোকটি জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে বেঁটে গোরাপানা মানুষটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। প্রতিদ্বন্দ্বীকে যেন জরিপ করে নিচ্ছে। ঘ্যাসঘেসে গলায় শুধোল, 'তুমি কোত্থেকে হে?'

বেঁটে মানুষটিও এক পলক খুব নিবিষ্ট চোখে চেয়ে রইল ঢ্যাঙার দিকে। সন্ধানী দৃষ্টি। প্রতিপক্ষকে সেও একটু বুঝে নিতে চায়। তা প্রতিপক্ষ বৈ কি! একই উদ্দেশ্যে যখন সুধন্য পাছালের বাড়িতে আগমন, দুজনেরই ডাক পড়েছে একই ঝামেলা মেটাতে, তখন একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী তো অবশ্যই। বেঁটের কণ্ঠস্বর একটু কর্কশ। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'নিবাস ধান্যবেড়িয়া। মানে ধানবেড়ে। তুমি কোত্থেকে হে নটবর?'

উত্তর এল, 'কাষ্ঠ সিকিরা। মানে কাঠসেঁড়ে। তা নামটা কী?'

'ভূপেন বাড়ুই। তুমি?'

'আমি হলাম গোপাল ধাড়া। তুমিই তাহলে ভূপেন বাড়ুই! নামটা শোনা লাগছে বটে।'

'তুমিই গোপাল ধাড়া! প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। পেন্নাম গ্রহণ করুন দাদা। বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। দাদাই বলব। আপনি আজ্ঞেও করব। আমাকে তুমি-ই বলবেন। বলছিলাম কী, আমরা দুজনেই তো দু' এলাকার শের। পাছালকর্তা তো একজনকে ডাকলেই পারতেন। এক নৌকায় দুজন মাঝি! ঝামেলা হল দেখছি।'

গোপাল ধাড়া বলল, 'ঝামেলা কীসের? আমরা যে যার রীতিতে কাজ করব।'

ভূপেন বাড়ুই বলল, 'ঠিক আছে, তাই সই।'

কাঠসেঁড়ের গোপাল ধাড়া আর ধানবেড়ের ভূপেন বাড়ুই। দু'জনেই এ-দিগরের মস্ত গুনিন। ভূতের ওঝা। ভূপেন বেঁটে আর ফর্সা, গোপাল লম্বা আর কালো। উভয়েই পরস্পরকে নামে চেনে, তবে চোখের দেখা এই প্রথম। কাঠসেঁড়ে আর ধানবেড়ের মধ্যে ছ'সাত মাইলের ব্যবধান। এই দূরত্বই হয়তো পরস্পরকে না চেনার কারণ।

গোপাল ধাড়ার মাথায় লম্বা লম্বা রুখু চুল। খসখসে খড়ি ওঠা গা। পরনে লুঙ্গির ধরনে গেরুয়া কাপড়, গায়ে আলখাল্লার মতো লম্বা ঝুলের গেরুয়া পাঞ্জাবি। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। চোখ দুটো জবাকুসুম-রাঙা আর আধবোজা। সদাই যেন শিবচক্ষু। দেখেই মনে হয় নেশা করার অভ্যেস আছে। গুনিন বললে বেশ মানায়। সমীহ জাগাবার মতো চেহারাছাঁদ আর হাবভাব। তুলনায়

ভূপেন একটু সাদামাঠা। ভেক ধরার কায়দা-টায়দার বিশেষ ধার ধারে না। তার পরনে চেককাটা লুঙ্গি, গায়ে শস্তা ছিটের শার্ট, পায়ে চটি, কাঁধে ঝোলা। চোখের চাউনি পরিষ্কার। ফুর্তিবাজ লোক বলে মালুম হয়।

সময়টা বিকেলের কাছঘেঁষা, ওরা দাঁড়িয়ে আছে সুধন্য পাছালের বাড়ির বাইরে। দুব্বোঘাস-ঢাকা চত্বরটায়, গুনিন আসায় উৎসাহী আর অলস লোকের ছোটখাট ভিড় জমেছে। পাড়ার একটা ছোকরা গুনিন আসার খবর দিতে গেছে পাছালকর্তাকে। একটু পরে খবর নিয়ে এল কর্তামশাই আহার সারছে, এখুনি নেমে আসবে দোতলা থেকে।

তা লোকটি এল একটু পরে। বয়স পঞ্চাশের এদিক-ওদিক। কাঁচা-পাকা চুল। চেরা সিঁথি, গায়ের রং না ফর্সা না কালো। চেহারাটা মোটার দিকেই। দু' হাতের আঙুলে গোটাকতক আংটি। সবগুলো সোনার নয়। শোভা বর্ধন, ভাগ্য বদল, বাতব্যাধি প্রশমন এবং ব্লাড সুগার রোধ— এই চারটি কারণে আংটিগুলি ধারণ করা হয়েছে বোঝা যায়। পাছালমশাইয়ের পরনে পাজামা আর গায়ে হাতকাটা গেঞ্জি। খাওয়াটা বোধহয় জব্বর হয়েছে। পরপর দুটো ঢেকুর তুলল, একটা বিড়ি ধরাল ধীরেসুস্থে। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে, দুই ওঝার দিকে একে একে তাকিয়ে ঈষৎ হেসে বলল, 'তোমাদের কে কোন্‌জন?'

ঢ্যাঙা ও বেঁটে নিজেদের পরিচয় দিল।

সুধন্য পাছাল বলল, 'ঠিক লোককেই দেখছি এনেছে আমার লোকেরা। তা কার কী মুরোদ সেটা তো শুনতে হয়।'

গোপাল ধারা বলল, 'আমার কাজ-কারবার ভূতেদের মধ্যে নৈকষ্যি কুলীন বেহ্মদত্যিদের নিয়ে। ওনারা যদি ঝামেলা পাকান আমি সামাল দিতে পারব।'

ভূপেন বাড়ুই বলল, 'পেত্নি, শাকচুন্নি, কন্ধকাটা— এদের নিয়ে আমার কারবার।

'বেশ, বেশ, ভালোই লাগল শুনে। তাহলে আজই কাজে লেগে যাও। কাল সকালের মধ্যে ঝামেলা মিটে গেলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যেতে পারবে।'

গোপাল ধাড়া হাত জোড় করে বলল, 'আজ্ঞে, এ তো এক দিনের কাজ নয় দিন তিনেক লেগে যেতে পারে।'

'মানে?'

'এ বহোৎ হুজ্জোতের কাজ আজ্ঞে। প্রথমে ধরুন, জাতসন্ধান, তারপর গৃহবন্ধন, তারপর মারণ উচাটন, তারপর হল গে সম্মার্জন, তবে তো পলায়ন।'

গুনিনের কথা শুনে পাছালের পো-র চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। ঢোঁক গিলে বলল, 'শুনেই তো ভির্মি লাগছে। ব্যাপারগুলো একটু বুঝিয়ে বলবে?'

গোপাল ধাড়া বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বাক্‌চতুর। বোঝানোর দায়িত্বটা সে নিজের কাঁধেই তুলে নিল। ভূপেন চরিত্রের ওজন ইতিমধ্যেই সে বুঝে নিয়েছে। বলল, 'জিনিসটা ভূপেনভায়াও জানে, তবে আমিই না হয় বলছি। জাতসন্ধান মানে ভূতটা বেহ্মদত্যি, না পেত্নি, না কন্ধকাটা, নাকি মামদো— সেটা বুঝে নেওয়া। মানুষের যেমন জাতপাত আছে তেমনি ভূতেদের ও আছে কিনা। রোগ বুঝে যেমন চিকিচ্ছে তেমনি ভূতের জাত বুঝে ক্রিয়াকরণ। মারণ-উচাটন হল ভূত তাড়ানোর পদ্ধতি। মারণ মানে তো মেরে ফেলার মন্ত্র। তা ভূতেদের তো মেরে ফেলা যায় না। কবার মরবে বলুন না! মানুষ মরেই তো ভূত। উচাটন তো বুঝতেই পারছেন— অস্থির করে তোলা। আমরা মন্তর-তন্তর ঝাড়ফুঁকে এমন কাণ্ড করি যে ওনারা পালাবার জন্য ছটফট করতে থাকেন। তবে ঝাঁটাপেটা না করলে কী পাজি ভূত এলাকা ছেড়ে যাবে? ভূতকে সম্মার্জনী নিয়ে মারার নামই হল সম্মার্জন। আর পলায়ন তো বুঝতেই পারছেন!

সুধন্য পাছাল মনে মনে ব্যাখ্যার তারিফ না করে পারল না। অবশ্য ভিতরে খুশি হলেও বাইরে গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলল, 'এসব জিনিস একদিনে হয় না তা ঠিক। আমার নতুন বাড়িতে বিস্তর ফাঁকা ঘর পড়ে আছে, সেখানেই থাকো তোমরা। খাবার ব্যবস্থা আমি করে দেব।'

ভূপেন বাড়ুই ভিতু-ভিতু গলায় বলল, 'নতুন বাড়ি! সেটা আবার কোন্‌টা?'

'সেটাই তো ভূতের বাড়ি। আমার বাড়ি দুটো। এটা পুরোনো বাড়ি। অনেক সাধ করে নতুন একটা বাড়ি বানিয়েছিলাম। দুঃখের কথা কী বলব, সেখানেই অপদেবতার চোখ পড়ল। গৃহপ্রবেশের দু'চার দিন পরে পালাতে পথ পাই না এমনি অত্যাচার। চলই না সেখানে, বেশি দূরে নয়।'

তা বাড়িটা কাছেই। জংলা ভুঁইয়ের ভিতর দিয়ে সুঁড়ি রাস্তা ধরে মিনিট পাঁচ হাঁটলেই বাড়িটা। সুন্দর একখানা দোতালা বাড়ি। চারপাশে পাঁচিল থাকায় বাড়ির বাহার বেড়েছে। সামনে বড়োসড়ো গেট। এক পাশে পাথরের ফলকে খোদাই করা আছে : পাছাল-ভবন।

বাড়ির আশপাশটায় জনবসতি নেই। কিছুদূরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে মাঠ। তার ধারে জলনিকাশি খাল। মোটকথা, পাছালমশাই নির্জন জায়গা দেখে শুনেই

বাড়ি বানিয়েছে। লোকটি সম্ভবত ভিড়ভাড়াক্কা, হই-চই পছন্দ করে না।

বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে চলে যাবার আগে সুধন্য পাছাল বলল, 'এখানেই তোমরা থাক। যাদের তাড়াতে এসেছ তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হোক। কাজের জন্যে লোক দিচ্ছি। যা যা দরকার তাকে বোলো। তবে সে লোক রাতে থাকবে না। ভরসন্ধের পর এদিকটায় কেউ মাড়ায় না। দরকার হলে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।'

বাড়ির ভিতর পাঁচিলের লাগোয়া কংক্রিটের একটা বেঞ্চি। লোকজন চলে যাবার পর দুই গুনিন বেঞ্চিটায় গিয়ে বসল। ফুরফুরে বাতাস দিচ্ছে, বেশ একটা ঠান্ডা-ঠান্ডার ভাব। চারদিক নিঃসাড়। দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ। খানিকটা উস্‌খুস্‌ করে ভূপেন বাড়ুই যেন নিজের মনেই বলল, 'তাহলে এখানেই আমাদের রাত কাটাতে হবে!'

গোপাল ধাড়া বলল, 'আমাদের কাছে এ তো রাজবাড়ি হে।'

'তা ঠিক। তবে বাড়িটা কেমন অলুক্ষুণে মনে হচ্ছে না, গোপালদা? আমি বেশ একটা গন্ধ পাচ্ছি। কীরকম ভূত-ভূত গন্ধ। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে, দেখুন।'

'তুমি আসলে ভিতু। আমার তো কই কিছু হচ্ছে না। ভূতের ওঝা ভূতকে ভয় পাচ্ছে শুনলে লোকে বলবে কী? এ তো ভালো ব্যাপার নয়। ভয় জিনিসটা একের থেকে অন্যের মধ্যে চারিয়ে যায়, তা জান?'

'ঠিক কথা। আচ্ছা গোপালদা, এই যে আপনি পাছালমশাইকে জাতসন্ধানের কথা বললেন একটু আগে, কোন্‌ ভূত বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে বুঝতে পারেন?'

'তোমার কী মনে হয়?'

ভূপেন একটু ভেবে-টেবে বলল, 'আমার মনে হয় আপনি গুল মেরেছেন।'

গোপাল ধাড়া অভিমানী গলায় বলল, 'আমাকে একথা বলার সাহস পেলে?'

'পেলাম। আমি তো এই করেই এতকাল চালিয়ে এলাম। এ লাইনে যে যত বড়ো গুলবাজ তার তত নামডাক।'

গোপাল-গুনিন এক গাল হাসল, 'সব লাইনেই তাই। তবে গুলবাজিটাও যত্ন করে শিখতে হয়। আমি তো অন্তত শিখেছিলাম। তবে আমাদের লাইনে আর তত মজা নেই। কাজ-কারবার ভালো চলছে না। প্রথমে ধর ভূতের বাড়ি গুণতিতে অনেক কমে গেছে। আজকাল কাউকে ভূতে পায় না বললেই চলে। ভূতেরা সব আল্‌সে আর ভদ্দরলোক হয়ে গেছে। লোকেও ইদানিং আমাদের বুজরুক-জোচ্চোর বলে উপহাস করছে। কিছু ছেলেছোকরা সভাসমিতি করে মানুষকে বোঝাচ্ছে ভূত বলে কিছু নেই— ভূত একটা গাঁজাখুরি ব্যাপার। মোটকথা, আমাদের আর বাজার নেই। এই বুড়ো বয়সে লাইন বদলাতে হবে দেখছি।' এই বলে গোপাল দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

রাতের খাওয়া দাওয়া চুকে যাবার পর গোপাল ধাড়া বলল, 'সবে তো রাত নটা। এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে কী হবে! তার চেয়ে চলো বারান্দার বসে গল্প করি।'

বারান্দায় এসে বসার পর নিজে একটা বিড়ি ধরিয়ে আর ভূপেনকে একটা দিয়ে গোপাল বলল, 'ভায়া, তোমার এই গুনিনগিরি বাপ-পিতেমোর কাছ থেকে পাওয়া বিদ্যে নাকি?'

ভূপেন ঘাড় নাড়ল, 'না, ও আমি নিজে নিজে শিখেছি। বাপ ছিল ছিঁচকে চোর। বাপের বাপ, তার বাপও তাই। টানা তিন পুরুষ পেরিয়ে আমাতে এসে ঠেকে গেল। বাপ আমাকেও ওই বড়ো বিদ্যে দিতে চেয়েছিল। আমি নিইনি। বড্ড ছোট কাজ। জানেন দাদা, আমার চোখ কান বরাবর খুব সজাগ, অবিশ্যি আপনার মতো নয়, কোথাও ওঝা কী গুনিন এসেছে শুনলেই ছুটে যেতাম। তা কী করছে, কী বলছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতাম। দু'একজন ওঝার কাছে যাতায়াতও করেছি। দেখলাম গোটা ব্যাপারটাই ফক্কিকারি। সেটা যেদিন থেকে ভালোভাবে শিখে গেলাম সেইদিন থেকেই আমি ওস্তাদ গুনিন।'

'কোথাও ভূত ছাড়াতে পেরেছ?'

'ভূত কী কাউকে ধরে যে ছাড়াব?'

'বাঃ, বেশ বলেছ ভায়া।'

'এবার আপনার কথা বলুন দাদা।'

'আমার কথা সামান্যই। আমাদের গুষ্টিতেও সাত জন্মে কেউ গুনিন ছিল না। আমার বাপটা ছিল ডাকাবুকো ধরনের। গায়ে খুব জোর ছিল। নেশাভাংও করত। নেশা করে এসে বাবার প্রতিদিনের ডিউটি ছিল আমাকে ঠ্যাঙানো, কারণে অকারণে। কড়া-পড়া সেই হাতের থাপ্পড় খেলে বাপের নাম বিস্মরণ হয়। মার খাবার ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতাম। আমার রাত কাটত আদাড়ে-পাঁদাড়ে, শ্মশানে-মশানে, গাছতলায়। একদিন এক সাধুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। লোকটা আমাকে খুব পছন্দ করে ফেলেছিল। সাধু আমাকে দুটো জিনিস শিখিয়েছিল— গাঁজা খেতে আর গেরুয়া পরতে। একদিন বলল, শুধু গাঁজা খেয়ে তো দিন চলবে না, পেটেও কিছু দিতে হবে। আর গেরুয়া কিনতেও পয়সা লাগে। তুই ব্যাটা ওঝাগিরি কর। নিখরচার ব্যবসা। কটা শেকড়-বাকড়, অং-বং-চং মন্তর আর ভড়ং — ব্যাস।

এতেই কেল্লা ফতে। তা সাধুর কথা অমান্যি করিনি। এই করে তো বছর বিশেক কাটিয়ে দিলুম।'

ভূপেন বাড়ুই ভক্তিভাবে বলল, 'নমস্য লোক দাদা, আপনাকে গুরু মানছি। প্রথমে বলেছিলাম যে যার পদ্ধতিতে কাজ করব। ঘাট হয়েছে। এখন বলছি যা করবেন তাতেই রাজি।'

'তাহলে এক কাজ কর। একটা টর্চ দিয়ে গেছে না। ওটা নিয়ে ঘরদোরগুলো ভালো করে দেখে এসো।'

'একা?'

'ওস্তাদের কথা শুনতে হয়।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভূপেন উঠল। মিনিট দশেক পরে ফিরে এসে বলল, ওপরতলার ঘরগুলো ফাঁকা। নীচের তলার তিনখানা ঘরে তালা দেওয়া। কোথাও কিচ্ছুটি নেই।

গোপাল ধাড়া ছোঁক-ছোঁক শব্দ করে, নাক টানল। তারপর চাপা গলায় বলল, 'কোন কিছুর গন্ধ পাচ্ছ?'

ভূপেন বলল, 'না তো!'

'ছেলেমানুষ। আমি পাচ্ছি। হরিণ, বাঘ, শেয়াল— এসবের গন্ধ।'

'আপনার কী মাথা খারাপ হয়ে গেল গোপালদা? ওসব এখানে কোত্থেকে আসবে?'

গোপাল ধাড়া রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসল, 'কেন আসবে না? সুন্দরবন তো মাত্র মাইল কুড়ি বাইশ দূর, আসতেই পারে। তেমন ঘ্রাণশক্তি থাকলে চামসে গন্ধটা তুমিও পেতে।'

ভূপেন সশব্দে ক'বার হাই তুলে তুড়ি বাজাতে বাজাতে বলল, 'বড্ড ঘুম পাচ্ছে। শুয়ে পড়ি চলুন।'

গম্ভীরমুখে গোপাল ধাড়া বলল, 'আজ রাতে ঘুমের চান্স নেই।'

ভূপেন অবাক, 'তার মানে? সারা রাত জেগে থাকতে হবে?'

'হবে। জেগে জেগে পাহারা দিতে হবে। আজ ভূতের জাতসন্ধান, কথা মনে রেখো।'

'তার মানে পেত্নি, মামদো, না বেহ্মদত্যি— এ বাড়িতে কোন্‌জন আছেন তা বুঝে নিতে হবে?'

'এই তো বুঝেছ ব্যাপারটা। আর সেটা এখানে বসে হবে না, বাইরে যেতে হবে।'

ভূপেন বেশ বুঝতে পেরেছে গোপাল গুণিনের কথা মানা ছাড়া উপায় নেই। লোকটা অনেক বেশি বুদ্ধি ধরে। অগত্যা উঠে দাঁড়াল। গোপালও উঠল। গেটের বাইরে বনঝোপ। গাছগাছালির জটলা। দুই গুনিন ঝাঁকড়া একটা কদম গাছের নীচে গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে রইল। রাত বাড়তে লাগল নিজের মনে। চারদিকে জ্যোৎস্নার চাদর বিছিয়ে আছে। পরিবেশটা কেমন

অলৌকিক লাগছে। একটা রাতপাখি ডেকে উঠল কু-স্বরে। যেন আসন্ন কোন ঘটনার পূর্বাভাস।

ভূপেন লোকটা ঘুমকাতুরে। মশার উপদ্রব এবং গাছে ঠেসান দেবার অস্বস্তির মধ্যেও তার ঢুল এসে গিয়েছিল। হঠাৎ পাঁজরে একটা খোঁচা খেয়ে সে কোঁক্ করে উঠল। তার কানের কাছে ফিস্‌ফিসিয়ে উঠল গোপাল গুণিনের গলা, 'চুপ। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখ।'

জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বাড়ির লাগোয়া সুঁড়ি রাস্তাটা দিয়ে এগিয়ে আসছে কালো চাদরে ঢাকা একাট মূর্তি।

'দেখতে পেয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'সামনে এলে দুজনে একসঙ্গে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে ওস্তাদ।'

কথামতোই কাজ হল। চাদরঢাকা মূর্তিটা যেভাবে আসছিল তাতে মালুম হয় কোনরকম বিপদের আশঙ্কা সে করেনি। হঠাৎ হুড়মুড় করে যে পাহাড় ভেঙে পড়বে মাথায়, ভাবেনি বেচারা। তাই তৈরিও ছিল না একটুও। গোপাল আর ভূপেন তাকে সপাটে এমন জড়িয়ে ধরল যে বাধা দেবারও অবকাশ পেল না। লোকটাকে কাবু করেই গোপাল ধাড়া বলল, 'ভূপেন, ঢাকনাটা খুলে দাও। দেখি চাঁদবদনটি কার।'

ভূপেন মূর্তির মুখের আবরণটা খুলে দিতেই যে মুখখানি বেড়িয়ে এল তা দেখে দুজনেই চমকে উঠল, 'তুমি!'

লোকটি আর কেউ নয় সুধন্য পাছালের কাজের লোক চূড়ামণি মণ্ডল। এই লোকটিই দুই গুণিনের দেখভাল করার দায়িত্বে আছে। তাদের খাবার দাবার দিয়েছে, ফাইফরমাস খেটেছে সন্ধে পর্যন্ত। গোপাল আর ভূপেন ওকে গামছা দিয়ে হাতে-পায়ে বেঁধে, ঘরে ঢুকিয়ে, শেকল তুলে দিল। তারপর গোপাল ধাড়া ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলল, 'জাতসন্ধানের কাজটা হল। বেহ্মদত্যি নয়, পেত্নি নয়, বাড়িটাকে ভুতুড়ে বানিয়েছে মানুষ জাত।'

ভূপেন বাড়ুই বলল, 'গৃহবন্ধনের কাজটাও হয়ে গেল। মণ্ডলের পো-কে তো আমরা গৃহের মধ্যেই বন্ধন করে রাখলুম। ওর আর নড়াচড়ার সাধ্যে নেই।'

দুই

তিন রাস্তার মোড়ে দোকানটা। পাছাল আটো সার্ভিস। সকাল দশটা। কাউন্টারের সামনে সুধন্য পাছাল চেয়ারে বসে। পিচঢালা রাস্তার ওপর দিয়ে একটা জিপ দ্রুত গতিতে এসে দোকানটার সামনে ব্রেক কষল। জিপ থেকে যারা নেমে এল তাদের গায়ে পুলিশি উর্দি। চার জনের দলটার সঙ্গে সাদা পোষাকের দুজন মানুষও রয়েছে। গোপাল ধাড়া আর ভূপেন বাড়ুই। গুনিন দুজন পুলিশের সঙ্গে কেন? চমকে উঠল সুধন্য পাছাল।

তবে বাইরে আপ্যায়িতের হাসি হেসে কাউন্টার ছেড়ে এগিয়ে এল সুধন্য। পুলিশের দলটার মধ্যে ইনস্পেকটর-ইন-চার্জ অর্ণব দত্তও আছেন। ভারী কড়াধাঁচের দারোগা। সুধন্য বিনীত কণ্ঠে বলল, 'অধমের দোকানে কী মনে করে স্যার? গাড়ির কোন গোলমাল নাকি?

'গাড়ি ঠিকই আছে। যাক্, এতদিনে আপনার খেলা ফুরোল।'

'কী বলছেন ভালো বুঝলাম না।'

'ঠিকই বুঝেছেন সন্দেহ অনেকদিন ধরেই হচ্ছিল। আমাদের ব্ল্যাক লিস্টে নামটাও তোলা ছিল। তবে ইনফরমেশনটা ঠিকমতো পাচ্ছিলাম না। আজ পেয়ে গেলাম। এই দুটি লোক সহযোগিতা না করলে আরও কতদিন দু'নম্বরি কাজ চালিয়ে যেতেন কে জানে! তা এদের চিনতে পারছেন তো!'

'ওরা তো ভূতের ওঝা। আমিই ওদের এনেছি।'

অর্ণব দত্ত হাসলেন, 'বলতেই হবে ভূত চিনতে ওরা ভুল করেনি। ওঝাগিরিটা ওরা সাকসেসফুলিই করেছে। চূড়ামণি মণ্ডলের পেট থেকে সব খবর বের করে জানিয়েছে আমাদের। খুব অনেস্ট লোক এরা।'

'চূড়ামণি! সকাল থেকে তো তাকে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না!'

'পাবেন কী করে! সে তো আছে পাড়ার ক্লাবের ছেলেদের হেফাজতে। গাঁয়ে আপনার শত্রুর অভাব নেই সুধন্যবাবু। ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে আপনার বিশেষ বনিবনা ছিল না। সেই সুযোগটাই নিয়েছেন গোপাল আর ভূপেনবাবু।'

সুধন্য পাছাল ভাঙবে তবু মচকাবে না। ফুঁসে উঠল বলল, 'আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কী বলুন তো।'

অর্ণব দত্ত বললেন, 'আপনার দোকানটা বাইরের একটা ঠাঁট মাত্র, মুখোস। দোকান বিশেষ চলে না। এইসব গাঁ দিগরে গাড়িঘোড়া তেমন কোথায় যে এরকম দোকান রমরমিয়ে চলবে? অথচ দিনে দিনে আপনার সম্পত্তি বাড়ছে। দুখানা বাড়ি, জমিজমা, পুকুর, ব্যাঙ্কে লাখ লাখ টাকা— এলাহি ব্যাপার। এত টাকা আসছে কোত্থেকে? নিশ্চয়ই চোরাপথে। তো আপনার আসল কাজটা হল বন্য জীবজন্তুর চামড়া পাচার। হ্যাঁ, বিদেশে। পোচার কিনা, চোরাশিকারিরা বাঘ-হরিণ সাপ এ সবের

চামড়া বেচে যায় কম দামে। আপনি ওগুলো চড়া দামে বেচেন শহুরে ডিলারদের। কিন্তু চামড়া স্টোর করা নিয়ে অসুবিধে হচ্ছিল। সেজন্যে একটেরে জায়গায় নতুন বাড়ি বানালেন। তবে ছোট্ট গ্রাম, কৌতূহলী মানুষের নজর এড়ানো কঠিন। অগত্যা বাড়িটাকে ভূতের বাড়ি করে তুলতে হল। আপনার লোক, ওই চূড়ামণি মণ্ডল, রাতের বেলা ওখানে জীবজন্তুর হাড়, মানুষের মাথার খুলি ফেলে আসত। মানুষ আর বাড়িটার ত্রিসীমানায় আসতে চাইত না। দিব্যি ব্যবসা চলতে লাগল।'

এত কথার পরও সুধন্য বলতে ছাড়াল না, 'আমি যে বাঘ-হরিণের চামড়ার চোরা চালানদার তা প্রমাণ করতে পারবেন?'

'প্রমাণ তো আপনার চূড়ামণিই দিয়ে বসে আছে। এই ওঝা মানুষ দুটি বেশ বুদ্ধিমান। বিশেষ করে গোপালবাবু বুঝতে পারেন বাড়িটাকে নিয়ে একটা ফাউল গেম চলছে। কাঁচা চামড়ার গন্ধও উনি পেয়েছেন। তারপর উনি ফাঁদ পাতেন। চূড়ামণি মণ্ডল তাতে আটকে পড়ে। তাকে চাপ দিতেই বেরিয়ে পড়ে যে আপনার বাড়ির একতলা একটা ঘরে ভল্টমতো আছে। সেখানেই কাঁচা মাল লুকিয়ে রাখা হয়। ব্যাপারটা এঁরা সাত সকালেই জানান আমাদের। এতক্ষণে সে-সবের খোঁজ পেয়ে গেছে আমার লোকেরা। বুঝলেন সুধন্যবাবু, পাপেরও গন্ধ থাকে। সেটাই আপনাকে ধরিয়ে দিল। যাই হোক, আপনাকে আমরা গ্রেপ্তার করছি। আদালতে যা বলার বলবেন।'

সুধন্য হঠাৎ ক্ষিপ্তের মতো দুই গুণিনের দিকে তাকাল, 'তোমাদের আমি ভূত তাড়াতে আনলাম আর আমাকেই তোমরা বিপদে ফেললে?'

গোপাল ধাড়া হেসে বলল, 'ভূতই তো তাড়ালুম। সম্মার্জনের কাজটা বাকি আছে। সেটা পুলিশই করবে।'

ছাড়াছাড়ি হবার সময় ভূপেন বাড়ুই বলল, 'হ্যাঁ, একটা খেল দেখালে বটে দাদা। খাঁটি বেহ্মদত্যিকেই ধরেছ। একটা শয়তান লোকের শয়তানি ঘোচাতে পেরেছ, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।'

'ভাবছি এবার থেকে ওঝাগিরি আর করব না। বড্ড লোক ঠকাতে হয়। সামান্য জমিজায়গা আছে, চাষবাস নিয়ে থাকব ভাবছি।

'আমিও তাই করব। ওই মিথ্যের কারবারে আর নিজেকে জড়াব না। ওঝাদের দিন শেষ। মাত্তর একদিনের সম্পর্ক, তাতেই তোমাকে বড়ো ভালো লেগে গিয়েছে। সময় পেলে ধানবেড়েতে যেও দাদা। আপনি থেকে 'তুমি'-তে নেমেছি বলে কিছু মনে কোরো না।'

গোপাল ধারা বলল, 'তুমি-ই তো বলবে। দাদা-ভাইয়ের সম্পর্ক যে! তা তুমিও যেও আমার ওখানে। কাঠসেঁড়ে এমন কিছু দূরে নয়।'

এরপর গোপাল গুনিন ধরল পুবের রাস্তা, ভূপেন ওঝা পশ্চিমের পথ। পুবে কাঠসেড়ে, পশ্চিমে ধানবেড়ে।

ছবি : দেবাশীষ দেব

৯০ বছরের সেরা ছোটদের পত্রিকা

সন্দেশ

মাসে মাসে পাবার মতো মজা আর নেই

তাই

তাড়াতাড়ি সন্দেশ-এর গ্রাহক হয়ে যাও, বন্ধুদেরও গ্রাহক করে দাও

গ্রাহক চাঁদা	এক বছর	দুই বছর	তিন বছর
হাতে নিলে	১২০৲	২২০৲	৩২০৲
ডাকে নিলে	২০০৲	৩৮০৲	৫০০৲

যোগাযোগ : সন্দেশ কার্যালয় : ১৭২/৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কলকাতা ৭০০ ০২৯

বই পাড়ায় : এ১৪ কলেজস্ট্রিট মার্কেট কলকাতা ৭০০ ০০৭

বীর পুরুষের গল্প

সর্বজিৎ সেন

গ্‌গ্‌গ্‌গ্‌গেট আউট
??

আগে যা ঘটেছে

আট বছর বয়েসি রূপু বেড়াল ভালোবাসে। একদিন বৃষ্টিতে ভেজা এক বেড়াল-বাচ্চাকে উদ্ধার করতে গিয়ে সে পড়ল ট্রাকের সামনে। আর দুর্ঘটনার পরেই দেখে কীভাবে যেন বেড়াল হয়ে গেছে সে! বেশ কিছু ভয়ানক ও মন্দ অভিজ্ঞতার পরে বেড়ালরূপী রূপুর একটা বিরাট প্রাপ্তি ঘটল— জেনি ওরফে যমুনাকে বন্ধু হিসাবে পাওয়া। তার কাছে রূপু যেমন আশ্রয় পেল, তেমনি বেড়াল-জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাঠও শিখে নিল। পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল যমুনা রীতিমতো মেম-ঘেঁষা। ওর মা-র দিদিমার দিদিমার দিদিমা ছিল দার্জিলিং-এ এক সাহেবের আশ্রয়ে। দিদিমা কলকাতার সাহেব পাড়ায় আর ও ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে। ওর মালিক বাড়ি বদলানোর সময় যমুনাকে ভুলে চলে গেলে ক্ষুব্ধ যমুনা সেই থেকে রাস্তায়।

গঙ্গায় ডুবন্ত যমুনাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালে রূপু আর যমুনার বন্ধুত্ব আরও গভীর হয়। এবার দু'জনে মিলে রাতের প্যাসেঞ্জার ট্রেনে লুকিয়ে চলল দার্জিলিং, যমুনার স্বজনের খোঁজে। কিন্তু প্রাকৃতিক শোভা মন ভোলালেও দার্জিলিং-এর বাকি অভিজ্ঞতা হল বেজায় খারাপ। একদিকে, উন্নাসিক মাসি যমুনাকে আত্মীয় বলেই স্বীকার করল না, অন্যদিকে রাতের আশ্রয় গুদাম ঘরে আগুন লাগলে কিছু মানুষের দয়ায় কোনোক্রমে প্রাণে বাঁচল ওরা। শেষমেশ, দু'জনেই সিদ্ধান্তে এল আর এখানে নয়, আপনার জায়গা— কলকাতাতেই ফেরা যাক।

ফিরে প্রথমেই ওরা গেল বুড়ো শিউপূজনের কাছে। শিউপূজন তাদের কী ভালোই না বাসত। কিন্তু এসে দেখল মারা গেছেন সেই বৃদ্ধ মানুষটি। ভীষণ মনখারাপের মধ্যে রূপুর বাবা-মাকে দেখার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। কিন্তু গিয়ে দেখল বাড়িতে তালা বন্ধ। মাসিমণিও বিড়ালরূপী-রূপুকে চিনতে পারল না। এরই মধ্যে আশ্চর্য যোগাযোগে যমুনা ফিরে পেল তার পুরোনো মনিবদের। এবার রূপু একদম একা।

চোদ্দ : আবার একলা

হাঁটতে হাঁটতে রূপু আবার ফিরল সেই লেক রোডে। ওদের বাড়ি তেমনি বন্ধ। কী করবে এখন? বড়ো একা মনে হচ্ছে নিজেকে। তবু যমুনাকে মনে মনেও দোষ দিতে পারে না ও। বেচারা অনেক কষ্ট করেছে। বাড়ির বেড়াল থেকে রাস্তার বেড়াল হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানো সোজা কথা নয়। তারপর যদি আবার ভালোবাসা, আরাম, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পায় তো ও ছেড়ে দেবে কেন? তাছাড়া, যমুনাকে রূপু দোষ দিতেই পারে না - যমুনাকে ছাড়া ও বেঁচে থাকতেই পারত না যে!

তবু রূপু একেবারে একলা। ভিতরে ভিতরে যে চিন্তাটা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে তা হল - বাড়ি বন্ধ কেন? ওদের সব খবর ভালো তো? মা ভালো আছেন তো? একবার মায়ের মুখটা দেখতে বড্ড ইচ্ছা করছিল ওর।

এর পরের দু-তিনটে দিন যেন একটা ঘোরের মধ্যে কেটে গেল। না, ওই পোড়া বাড়িতেও আর ফিরে যায় নি রূপু। ওদের লেক রোডের বাড়িও নিঝুম, নিথর। বাড়িটার ওই চেহারা ও যেন আর সহ্য করতে পারছিল না। কিন্তু যায় কোথায়? ওই দু-তিন দিন ও যে কোথায় যায় নি তার হিসেব দেওয়া বরং সহজ। মাসিমণির বাড়ি, ওর মার দুই বন্ধুর বাড়ি, বাবার কাকার বাড়ি, বাবার এক ডাক্তার বন্ধুর বাড়ি— যে কটা বাড়ি ওর জানাশোনা, আর একটু কাছাকাছির মধ্যে সে সব জায়গাতেই গেছে বার বার। যদি মাকে একবার দেখতে পায়! পায় নি।

কানে বাজছিল সেই কথাগুলো 'অ্যাক্সিডেন্ট — খোকন — অ্যাম্বুলেন্স — উডল্যান্ডস'। ওর কেন জানি মনে হল ওই উডল্যান্ডস হাসপাতালে গেলেই মায়ের হদিশ পাওয়া যাবে। কিন্তু কোথায় যে হাসপাতাল? কে বলে দেবে রূপুকে? ওর আট বছরের জীবনে ও তো কখনও উডল্যান্ডসে যায়নি, এমনকি কোন হাসপাতালেই যায়নি। তবু সমস্ত দক্ষিণ কলকাতা ও চরকিপাক খেলো, কোথাও উডল্যান্ডস হাসপাতালের হদিশ পেল না। বরং দেখতে পেল রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠান, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল আর শেঠ সুখলাল কারনানি মেমোরিয়াল হাসপাতাল, যাকে সবাই এখনও পি জি হাসপাতালই বলে। উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করল সব হাসপাতালের দরজাতেই - যদি মা এখানে এসে থাকে! কিন্তু অত বড়ো বড়ো হাসপাতাল, অত মানুষের ভিড়, তার মধ্যে রূপুর মা কোথায়?

এই ভাবেই বোধহয় তিনটে দিন কেটে গেছে। ঘুমিয়ে নিয়েছে কোথাও একটা দু-তিন ঘণ্টা, খেয়ে নিয়েছে নেংটি ইঁদুর যা প্রায় সর্বত্রই সহজলভ্য, তেষ্টা পেলে খেয়েছে নর্দমার জল। হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরল রূপুর। যমুনার কথা তো শোনে নি সে! যমুনা বলেছিল লেক রোডের পোড়ো বাড়িতে অপেক্ষা করতে - সে তো ওদিক মাড়ায় নি। এখন যমুনা ওকে আর খুঁজে পাবে না। কত চিন্তা করবে বেচারা!

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে আবার লেক রোডের দিকে রওনা দিল রূপু। ঘণ্টা চারেক বাদে হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছল। ওদের বাড়ির অবস্থা সেইরকমই। এবার প্রায় দৌড়েই পৌঁছল পোড়ো বাড়িটায়। কিন্তু এ কী?

পোড়ো বাড়িটার প্রায় কোনও চিহ্নই নেই। বুলডোজার দিয়ে তার একটা পাশ ভাঙা হচ্ছে। বেশ ক'জন কুলি দরজা, জানালা, মার্বেল পাথর গুছিয়ে জড়ো করছে এক পাশে। তারপর তা তোলা হচ্ছে পেল্লাই পেল্লাই লরিতে। ধুলো উড়ছে, লাল সুরকির গুঁড়ো মেশানো। প্রচণ্ড আওয়াজ।

এদৃশ্যে যে কেউ চমকে উঠবে। রাতারাতি বাড়িটার ভোল পাল্টে গেল নাকি? আর সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা বেড়ালদের কোন চিহ্নই নেই। যমুনা যদি নাও ফিরে আসে, ওবাড়ির ছ-ছটা বেড়াল গেল কোথায়? বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব কথাই ভাবছিল রূপু।

তারপর ভাবল, যমুনাকে খোঁজা যাক। যমুনা তার নতুন বাড়িতে ভালো আছে তো? সোজা রওনা দিল বিবেকানন্দ পার্ক আর অল্পক্ষণের মধ্যে পৌঁছেও গেল। নতুন ফ্ল্যাটবাড়িটার সামনে অপেক্ষা করতে লাগল ও। আর, কী আশ্চর্য, প্রায় তখুনি সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ইভন তার তার মা। দ্রুত পা চালিয়ে চলে যেতে গিয়েও ও থমকে দাঁড়াল রূপুকে দেখে। মায়ের হাত ধরে টেনে বলল, 'হোয়াই, মাম, আই বিলিভ ইট্‌স দ্যাট হোয়াইট কিটি হু কেম উইথ জেনি। কিটি, কিটি, ডু ইট নো হোয়েয়ার জেনি ইজ? আই হ্যাভ নট সীন হার সিন্স দ্যাট নাইট'।

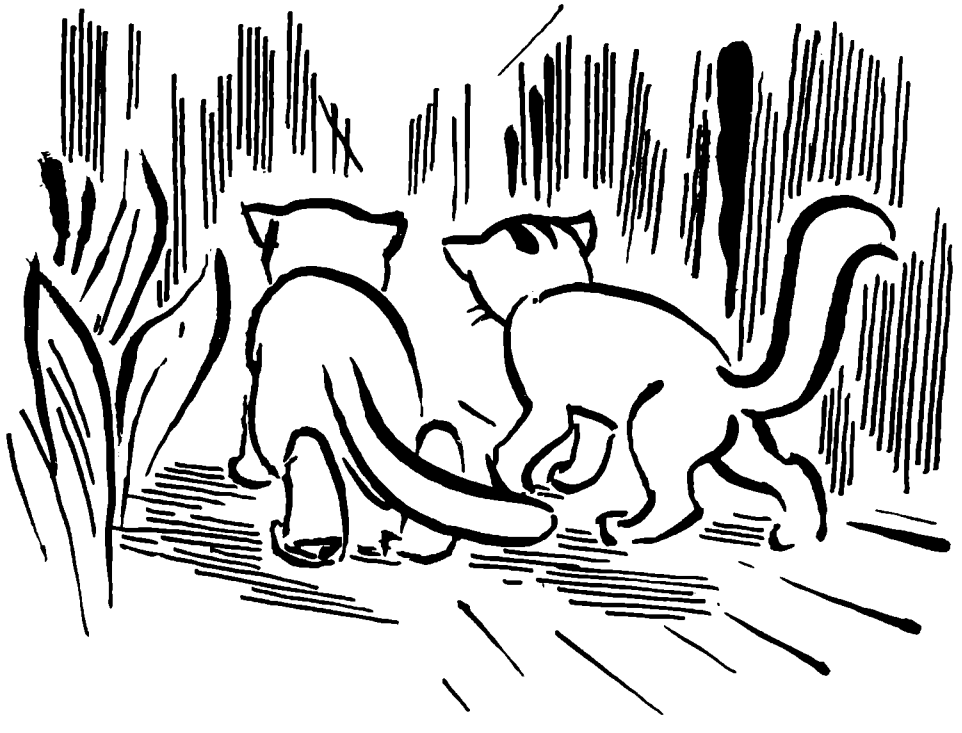

রূপুর বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। যমুনা এখানে নেই? তবে কী সে রূপুকে খুঁজতে গিয়েছিল? কিন্তু রূপু তো কথা রাখেনি। ওবাড়িতে গিয়ে যমুনা কী করল? আর ও বাড়িতে তো এখন কেউই নেই। তবে যমুনা গেল কোথায়? ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ইভন বলে উঠল 'মামি, আই ডু বিলিভ হি কেম ইন সার্চ অফ হার। হিয়ার ইজ ফেথফুল ফ্রেন্ডশিপ ফর ইউ। পুওর কিটি!'

কথাগুলো রূপুর মনে দাগ কেটে বসল। পুওর রূপু তো বটেই! কিন্তু সে তো বন্ধুকে দেওয়া কথা রাখেনি। সে কেমন করে ফেথফুল ফ্রেন্ড হবে?

দুঃখিত মনে সে আবার হাঁটতে হাঁটতে লেক রোডে এল। এবার দেখল জানালায় দুই বোন সীতা আর গীতা। রূপুকে দেখেই ওরা বলল, 'এই যে রূপু, কোথ্থেকে এলে তুমি? তোমাকে কত খুজছিল যমুনা।'

রূপু তো অবাক, 'যমুনা আমাকে খুঁজছিল? কেমন করে এল এখানে? পোড়ো বাড়িটারই বা কী হল?'

কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর সীতা বা গীতার অজানা। নিজেদের বাড়ির বাইরের কোন খবরই রাখে না ওরা।

অগত্যা রূপু চলল টমচাচার খোঁজে। মোড়ের বাড়িটার গ্যারেজের ছাদে সে শুয়েছিল। রূপুকে দেখে উঠে বসল, 'এই যে চাঁদ, গিয়েছিল কোথায়? তোমাকে খুঁজে খুঁজে যমুনা অস্থির।' তারপর রূপুর উদ্‌গ্রীব প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'রোসো বাপু! আদ্যোপান্ত বলছি। যমুনার পুরোনো মনিবের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। সে তাকে বাড়িতে নিয়ে যায়। তুমি একটু অভিমান করেছ দেখে ও তোমাকে চেঁচিয়ে বলে পোড়ো বাড়িটাতে থাকতে, ও সময় মতন আসবে। সেই রাত্রেই ও বাড়ি থেকে পালিয়ে যমুনা হাজির হয় পোড়ো বাড়িটায়। এসে তোমাকে পায় নি। সারারাত অপেক্ষা করেছিল। তারপর সারাদিন তোমাকে রাস্তায় রাস্তায় খুঁজেছে— কোথাও পায় নি। আমার সঙ্গে দুবার দেখা হয়েছিল। সে রাতে আবার ফিরে আসে ওই বাড়িটায়। আর সে রাতেই ও বাড়িতে একদল লোক নিয়ে চড়াও হয় একজন। সে নাকি প্রোমোটার, ওই ভাঙা বাড়িটা কিনেছে। রাতেই ওর লোকেরা লাঠিবাজি করে বেড়ালদের তাড়িয়ে দেয়। দুজন ভিখিরিও ছিল ওই বাড়িতে, তাদেরও মেরে তাড়ায়। অন্য বেড়ালরা পাড়া ছাড়া হয়ে যায়। কিন্তু যমুনা কাল সমস্তটা দিন তোমার জন্য অপেক্ষা করে ছিল। সারাদিনেও তোমার দেখা না পেয়ে সন্ধ্যার পরে কোথায় যেন চলে গেছে। আমি তো তখন ছিলাম না, তাই জানিনা।'

রূপু শুনল নীরবে। যমুনার প্রতি ওর শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। কিন্তু রূপু এখন যমুনাকে খুজবে কোথয়?

পনেরো : শেষ লড়াই

লেক রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে চুপচাপ ভাবছিল রূপু, কোথায় যেতে পারে যমুনা? এ তল্লাটে যে সে নেই তা নিশ্চিত। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতন একটা চিন্তা খেলে গেলে রূপুর মাথায়। রাসেল স্ট্রিটের সেই গুদাম, যেখানে তাকে আশ্রয় দিয়েছিল যমুনা, সেখানেই ও ফিরে যায় নি তো? দার্জিলিং ফেরৎ ওরা দেখেছে যে সেই গুদামের দরজার নীচটা এখনও ভাঙা।

মনে হতেই যেন দেহে নতুন বল পেল রূপু। প্রায় দৌড়ে রওনা হল রাসেল স্ট্রিটের দিকে। ম্যারাথন দৌড়বাজের মতন চলতে লাগল রূপু। লেক রোড, ল্যান্সডাউন, রাসবিহারী, হাজরা পেরিয়ে গেল। যদুবাবুর বাজার, এলগিন রোড যখন ছাড়াচ্ছে, তখন তার গতি মন্থর হয়ে এসেছে। সার্কুলার রোড, থিয়েটার রোড ছাড়িয়ে লিটল রাসেল স্ট্রিটে যখন ঢুকল, তখন প্রায় হাঁটি-হাঁটি-পা-পা চলছে সে। রাসেল স্ট্রিটে পা দিয়েই কিন্তু চঞ্চল হয়ে উঠল রূপু।

খানিকটা এগোতেই রাসেল এক্সেচেঞ্জের গুদাম-দরজা। নীচে ফাঁক। সে ফাঁক দিয়ে গলে ঢুকতে ঢুকতে জানান দিল রূপু। একটা ক্ষীণ কণ্ঠে সাড়াও পেল। আশা-নিরাশায় দুলতে দুলতে এক দৌড়ে ঢুকল রূপু। সেই বহু-পরিচিত ঘর, যদিও আসবাব-পত্র অনেকটাই পাল্টে গেছে। ঢুকেই দেখল খাটের পাশে যমুনা। কিছুটা ম্লান মুখে বসেছিল, অবশ্য রূপুকে দেখেই তার মুখে যেন দপ্ করে আলো জ্বলে উঠল। যমুনা বলল, 'যাক, তোমাকে দেখে নিশ্চিন্ত হালাম। যা চিন্তায় ছিলাম এ কদিন!'

গত তিন-চারদিনের অভিজ্ঞতা বিনিময় হল দুই বন্ধুর মধ্যে। যমুনা বলল, 'ইভনের বাড়িতে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এ জিনিস আর আমার জন্য নয়। প্রথম কথা, তোমাকে ওরা ঢুকতে দেয় নি। দ্বিতীয়ত, এর মধ্যে ইভনের বয়স বেড়ে গেছে প্রায় দু-বছর। এখন ওর জীবনে আরও অনেক আকর্ষণ এসে গেছে। তৃতীয়ত, বয়স তো একা ওর বাড়েনি, বেড়েছে আমারও। আর তুমি জানই, একজন বেড়ালের জীবনে দু-বছর মানে মানুষের জীবনের চোদ্দ বছর। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চতুর্থ কারণটি, আমি বুঝতে পেরেছি যে দু-বছর স্বাধীন জীবন কাটিয়ে আমি আর কারোর পোষা হয়ে থাকতে পারব না, তা সে মানুষটি আমাকে যতই ভালবাসুক না কেন।'

রূপু বলল, 'যাক সে সব কথা। যাক, যা গেছে তা যাক। এখন শুধু বল এর পরে আমারা কী করব।'

যমুনার মুখে একটা কালো ছায়া পড়ল। শান্তভাবে সে বলল, 'রূপু, তোমাকে তো মা-বাবার খোঁজ করতে হবে। কী ভাবে কী করবে, তার একটা প্ল্যান করা দরকার। তবে আমি হয়তো তোমার সঙ্গে থাকতে পারব না। তোমাকে নিজেই সব ব্যবস্থা করতে হবে।'

রূপু উত্তেজিত হয়ে বলল, 'তার মানে? যা কিছু করার আমরা তো এক সঙ্গেই করেছি এপর্যন্ত। তাই করব ভবিষ্যতেও।'

যমুনা গম্ভীর ভাবে বলল, 'তা হয় না, রূপু। তুমি এখনও বেড়াল সমাজের সব নিয়ম-কানুন জান না। তোমার এপাড়ার সেই হলদে হুলোটার কথা মনে আছে?'

রূপু বলল, 'মনে নেই আবার! গামা না কী যেন ওর নাম। ও তো আমাকে প্রায় খুন করে ফেলেছিল। আমি কী ওকে ভুলতে পারি?'

যমুনা বললে, 'আজ সকালে ও আমাকে ডেকে গেছে। আমাদের সমাজের নিয়ম অনুসারে তেরাত্তির পেরোলেই আমাকে ওর সঙ্গে চলে যেতে হবে। এর কোনও নড়চড় নেই।'

রূপু বলল, 'তার মানে? স্বেচ্ছায় তুমি ওর সঙ্গে যাবে?'

যমুনা বলল, 'স্বেচ্ছায় কীসের? আমি তো জানিই ওটা বদমাশ, খুনে গুণ্ডা। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। তবে জেনো আমি যেখানেই থাকি না কেন, মনে মনে আমি তোমার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে থাকব। এত ভালো ছেলে তুমি, তোমার কথা কী আমি ভুলতে পারি?'

এই প্রথম যমুনা ওকে বেড়াল না বলে ছেলে বলল। রূপু তা খেয়াল না করেই বলল, 'এ কীরকম অন্যায় নিয়ম তোমাদের? তুমি যেতে চাওনা, তবু যেতেই হবে? আর কোনও উপায় নেই?'

যমুনা বলল, 'আছে বইকি। তবে ... না, না, বড়ো ভয়ঙ্কর সেই পথ। তার থেকে আমার চলে যাওয়াই ভালো।'

রূপু জোর-জবরদস্তি করায় শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে যমুনা বলল, 'দেখ, বেড়ালদের সমাজে এ ব্যাপারে নিয়মটা পরিস্কার। কোনও বেড়ালকে কোনও হুলো যদি ডাকে, তার সঙ্গে তাকে যেতেই হবে, যদি না...'

ওকে বাধা দিয়েই বিচলিত রূপু বলে ওঠে, 'যদি না, কী? তুমি অপছন্দ করলেও ওর সঙ্গে যেতেই এরকম বিধান চলতে পারে না। একটা কোন উপায় থাকবেই।'

যমুনা বলে, 'আছে, কিন্তু বড়ো ভয়ঙ্কর সেই পথ। না, না, তার থেকে আমার চলে যাওয়াই ভালো।'

রূপু বলল, 'কী বলছ তুমি? বল না, কী উপায় আছে?'

একটু থেমে যমুনা বলল, 'নিয়মটা বড়ো কঠিন। ওর সঙ্গে আমাকে যেতেই হবে, যদি না আর কেউ আমার হয়ে ওর সঙ্গে লড়াই করে ওকে হারিয়ে দেয়।'

রূপুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বলে, 'এ তো সহজ ব্যাপার। আমি লড়াই করব ওর সঙ্গে।'

এবার বিচলিত হবার পালা যমুনার, 'না না, কী বলছ? গামা একটা খুনে গুণ্ডা, ওর সঙ্গে তুমি কী করে পারবে? কত বেড়ালকে যে ও খুন করেছে তার ঠিক নেই।'

রূপু বলে, 'তুমি ভাবছ আমি সেই আগের রূপু আছি। দেখছ না, গত চার মাসে আমি কীরকম শক্ত-পোক্ত হয়েছি? আমি ঠিক পারব, ওই গামার নাকে আমি ঝামা ঘষে দেব।'

সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে যমুনা দেখল, রূপু সত্যিই আর আদুরে বেড়াল নেই। তার শরীর যেমন সুগঠিত হয়েছে, মুখেও আত্মবিশ্বাসের হাসি। তবু চিন্তিতস্বরে বলল, যমুনা, 'ও তো পাড়ার মস্তান। পথে-ঘাটে মার-ধোর খুন-খারাপি করে বেড়ায়। ওর সঙ্গে লড়াই করা সহজ ব্যাপার নয়। তুমি কী পারবে, রূপু?'

রূপু জোরের সঙ্গে বলল, 'পারতেই হবে। না যদি পারি তো লড়াই করে হারব। তবু আমার জীবন থাকতে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও গুণ্ডা তোমাকে টেনে নিয়ে যেতে পারবে না।'

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে গর্বে যমুনা বুক ভরে গেল। কিন্তু সে জানত কাজটা কতখানি শক্ত, তাই সঙ্গে সঙ্গেই বলল, 'তাহলে আর কথা নয়, শুধু তালিম। এই তিনদিন খাওয়া আর বিশ্রাম বাদে শুধু লড়াই, লড়াই, লড়াই- মানে লড়াইয়ের তালিম।'

যে কথা সেই কাজ। যে গুদামে লড়াইয়ের রীতি-নীতি শিখেছিল রূপু চারমাস আগে, সেই গুদামেই এখন লড়াইয়ের মহড়া চলতে লাগল। যমুনা দেখল,বাস্তবিকই রূপু এখন অনেক পরিণত। অত্যন্ত দ্রুত সরে যেতে পারে, পাশে বা উপরে লাফ দিতে সিদ্ধহস্ত, মাথার ঢুঁ দিয়েই যমুনাকে ছিটকে ফেলে দিতে পারে। শুধু যমুনার উপর নখ বা দাঁত চালাতে তার আপত্তি। যমুনা বলল , 'এ লড়াইয়ে কিন্তু কোনও মায়াদয়া নয়। একটু নরম হয়েছ কী মরেছে!'

রূপুকে উত্তেজিত করতে সেও নখ-দাঁত ব্যবহার করতে শুরু করল। রূপুর কানে পিছনের কামড় আর চোখের নীচের আঁচড় দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত পড়তে লাগল। রূপুও তখন আর মায়াদায়া দেখাল না। রক্তাক্ত দেহে দুজনে হাঁফাতে হাঁফাতে যখন বিশ্রাম করতে বসল, তখন যমুনা শুধু বলল, 'সাবাস রূপু!' তারপর দুজনে চেটে নিজেদের শরীর পরিষ্কার করল। চোট-আঘাতও তাতে নিরাময় হয়, মানে 'ফার্স্ট এড' আর কী!

এইভাবে কখন যে তিনটে দিন কেটে গেল ওরা টেরও পেল না। রূপু নিজেই বুঝতে পারল ওর দম আর ক্ষিপ্রতা অনেক বেড়ে গেছে শুধু যমুনার মতে তাকে আরও হিংস্র হতে হবে।

চতুর্থদিন সকালে যমুনা বলল, 'আজ আর মহড়া নয়। সন্ধ্যায় লড়াই। শরীরটা ফ্রেশ থাকা প্রয়োজন।' সারাদিন নেংটি খেয়ে, বিশ্রাম করে আর নানান ট্যাক্‌টিক্স আলোচনা করে কাটল।

সন্ধ্যার মুখে একচোট প্রবল বৃষ্টি হয়ে গেল। তার পরেই সারা পাড়া কাঁপিয়ে হুলো বেড়ালের ডাক 'অ্যা-ও। যমুনা , আ-ও। যমুনা, আ-ও।'

বেশ হিংস্র সে ডাক। রূপু চমকে উঠল, কিন্তু সেও তৈরি ছিল। দরজার নীচের ফাঁক গলে রাস্তায় বেড়িয়ে নিজের শরীরটা ফুলিয়ে প্রায় ডবল করে সে হাঁক পাড়ল, 'অ্যা-ও। যমুনা যাবেনা-ও।'

গামা তো একেবারে অবাক। 'আরে ছুঁচো, তুই না সেই সাদা বেড়ালটা, যাকে মেরে আধমরা করে ফেলেছিলাম। আয়, আজ অসমাপ্ত কাজটা সেরে ফেলি।'

রূপু উত্তরে ছড়া কেটে বলল, 'আয়রে আয়, আয় না গামা
আজ ও নাকে ঘষবো ঝামা।
বাঁচায় দেখি কে তোর মামা?
হাঁটবি না আর, টানবি হামা।'

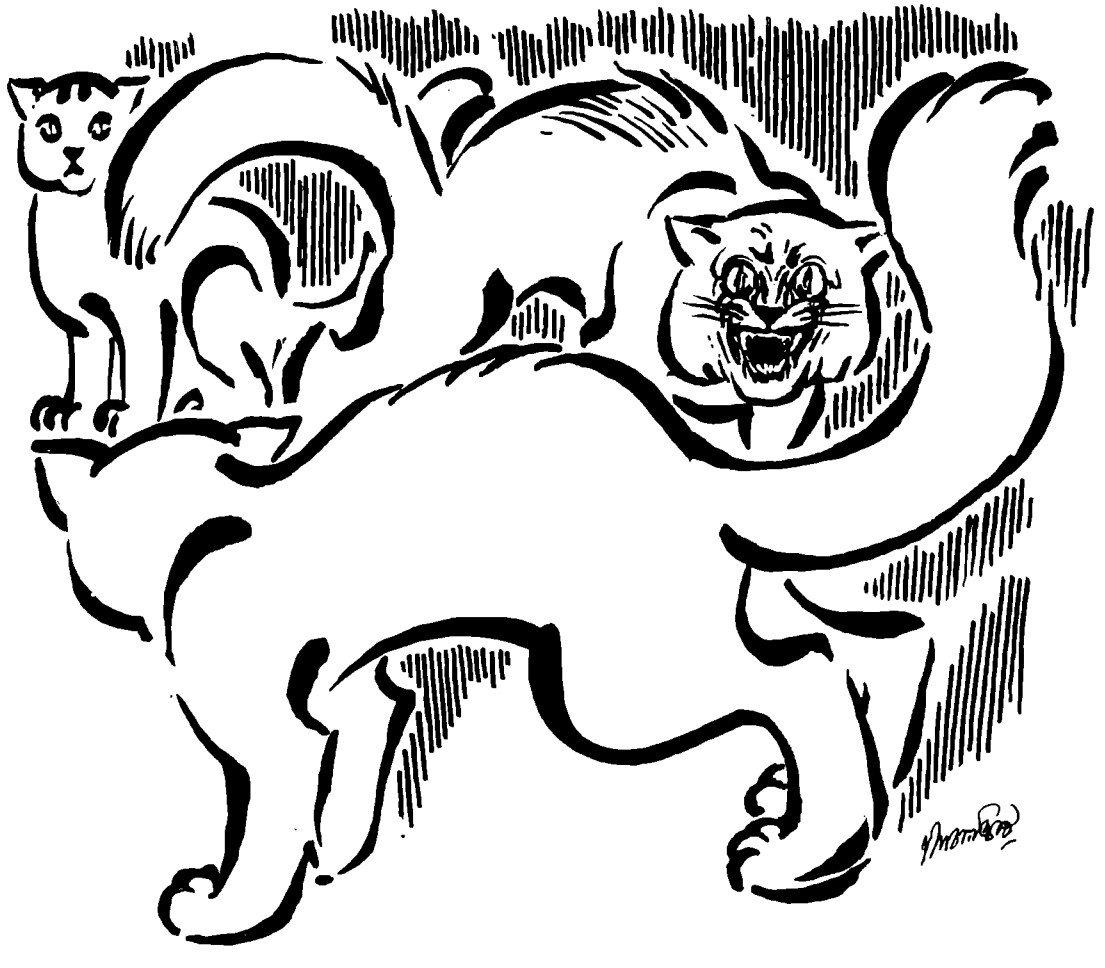

ওর ছড়া শুনেই রাগে গর্জন করে উঠল গামা, 'আয় লড়ে যাই। তুই এবার মরবি।'

রূপু রাস্তার মাঝখানে রুখে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ওর মনে পড়ল 'নিজের সুবিধা মতন যুদ্ধক্ষেত্র বাছো।' রাস্তায় লড়াই করে তো গামা সিদ্ধহস্ত, কিন্তু গুদামের ভিতরটা রূপুর অনেক ভালো চেনা। তার জায়গাটা অন্ধকার। 'আয় না, আয়' বলেই রূপু গুদামের মধ্যে সরে এল।

রাগে একলাফ দিয়ে গামা ওই দরজার ফাঁক গলে ঢুকল। অন্ধকারে চোখটা সইয়ে নিতে যেই একটু দাঁড়িয়েছে, সেই রূপু পাশ থেকে ওর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ওর ছেঁড়া কানটা প্রায় উপড়ে নিয়েছে, থাবারও এক মোক্ষম বাড়ি দিয়েছে চোখের নীচে, কিন্তু টুঁটি টিপে ধরতে পারে নি। অভিজ্ঞ ফাইটার গামা ঘাড় ঝাঁকিয়ে ওকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তারপর লাফিয়ে পড়েছে ওর উপরে।

এরপর মারামারিতে এত দ্রুত পট পরিবর্তন হতে লাগল যে যমুনাও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না কী ঘটছে। কখনও রূপু ওপরে, কখনও গামা। দুজনের শরীরই রক্তাক্ত, বেশ খোঁড়াচ্ছে, গামা পিছনের দুপায়ে। ওরা দুজনেই তখন বুঝতে পেরেছে এ লড়াই শেষ হবে ওদের একজনের মৃত্যুতে। মনে মনে রূপু বার বার বলছে, 'এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে।'

শেষে রূপুর গতির কাছে পরাস্তা হল গামা। মাথার ঘায়ে ওকে মাটিতে পেড়ে ফেলে ওর টুঁটি কামড়ে ধরল রূপু। এবারে হাততালি দিয়ে উঠল যমুনা, 'সাবাস, রূপু।' কিন্তু বহুদিনের যোদ্ধা গামা তখন হাল ছাড়েনি। শরীরটা একবার আলগা করে দিয়ে আবার জোরসে ঝটকা দিল। রূপু ছিটকে পড়ল এক পাশে। ঝাঁপিয়ে পড়ে মাথার ঢুঁতে ওর দু-তিনটে পাঁজর ভেঙে দিল গামা। তারপর সামনের বা পায়ে সজোরে দাঁত বসাতেই যে শব্দটা হল তাতে রূপুর স্পষ্টই বুঝল যে হাড়টা ভাঙল। তারপর আবার মাথায় বসিয়ে দিল এক মোক্ষম কামড়।

কোনওমতে ওকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েই রূপু বুঝল আর বেশিক্ষণ লড়া যাবে না, হয় এসপার নয় ওসপার। মাথা থেকে অঝোরে রক্ত পড়ে ওর দু-চোখ প্রায় বন্ধ, সামনের বাঁ পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা, বেদনা পাঁজরেও। বুঝতে পারছে গামার অবস্থাও তথৈবচ কিন্তু নতুন উদ্যোগ নেবার যেন দৈহিক শক্তি ওর আর নেই। হঠাৎ মাথায় বিদুৎ চমকের মতো একটা বুদ্ধি খেলে গেল। লেংচে লেংচে দরজার ফাঁক গলে আবার এল রাস্তায় — যেন পালিয়ে যাচ্ছে। একটা গর্জন করে ওর পিছু নিল গামা। কিন্তু দরজার পাশেই অপেক্ষা করছিল রূপু। এবার মাথার ঢুঁ দিয়ে গামাকে ফেলল নর্দমায় — যে নর্দমা দিয়ে খানিক আগের প্রবল বর্ষণের ফল স্বরূপ জল বয়ে যাচ্ছিল।

জলে পড়তেই গামা যেন আঁতকে উঠল। বেড়ালদের চিরকালের ভয় জলে। কিন্তু রূপু তো অ্যান্ডারসন ক্লাবের সাব-জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন! সে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণপণ শক্তিতে গামার মাথাটা জলের তলায় ঠেলে দিল। ছটফট করতে করতে হঠাৎ নিথর হয়ে গেল গামার দেহটা।

সে জিতেছে, এই ধারণাটাই তাকে বল জোগাল। নর্দমা থেকে রাস্তায় উঠে জয়ধ্বনি দিতে চাইল রূপু। কিন্তু গলা দিয়ে তার স্বর বেরোল না, দৃষ্টি ঝাপসা, মাথা ঘুরে গেল। দু-চোখের সামনে কে যেন একটা কালো পর্দা টেনে দিল। রূপুও বোধহয় এবার সেই স্বর্গে চলল, যেখানে তার ঠাকুর্দা-ঠাম্মা গেছেন, যদিও স্বর্গ জায়গাটা ঠিক কোথায় সে সম্বন্ধে খুব একটা স্পষ্ট ধারণা নেই তার।

অন্ধকারের গভীর অতলে তলিয়ে যাবার আগে রূপু শুধু শুনতে পেল যমুনার বুকফাটা আর্তনাদ 'রূপু, ফিরে এসো।' টের পেল যে কাঁদতে কাঁদতে যমুনা তার সারা গায়ে চাটছে। তারপর গভীর বিস্মৃতি গ্রাস করল তাকে।

আগামী সংখ্যায় শেষ

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

[বিদেশি গল্পের ছায়া অবলম্বনে]

সেলাই-বাক্স

কল্যাণী চক্রবর্তী

লীলা একটা ছোট সহরে তার ঠাকুরমার কাছে থাকে। তাদের বাড়ীটা সহরের বাইরে খোলা জায়গায়। বাড়ীর এক পাশে স্কুল, আর একদিকে মাঠের মধ্যে একটি কুঁড়ে ঘর, সেটাতে কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে থাকে, তাদের কেউ নাই, তারা খুব গরীব—ছোট্ট ঘরটিতে অনেক কষ্টে থাকে। তাদের সবচেয়ে বড় বোন শোভার সঙ্গে লীলার খুব ভাব। লীলা প্রায়ই তাদের বাড়ী যায় আর যাবার সময়ে শোভার ছোট ছোট ভাই বোনদের জন্য কিছু না কিছু কিনে নিয়ে যায়। তারা জিনিষ পেয়ে খুসী হয়, তাই দেখ্‌তে লীলার খুব ভালো লাগে।

একদিন লীলা স্কুলে গিয়ে দেখ্‌ল, তার ক্লাসের বীণা বলে একটি মেয়ে খুব সুন্দর একটা সেলাইএর বাক্স এনেছে, তার ঢাক্‌নীতে কেমন সুন্দর ফুলপাতা কাটা, বাক্সের ভিতর কেমন সিল্কের গদি দেওয়া, ছোট ছোট খোপের মধ্যে কাঁচি, ছুঁচ, উল বুন্‌বার কাঁটা, রঙ্গিন সুতার রিল, আর সেলাই কর্‌বার নানান্ রকম জিনিষ সাজান রয়েছে। বাক্সটা দেখে লীলারও সে রকম একটা কিন্‌বার ইচ্ছা হ'ল, সে বীণাকে জিজ্ঞাসা করে জান্‌লো যে বাক্সটার দাম 'দশ টাকা'।

বাড়ী এসে লীলা তার ঠাকুরমার কাছে সেই রকম একটা সেলাইএর বাক্স চাইল; কিন্তু দাম শুনে তার ঠাকুরমা বল্লেন, 'ও বাবা! অত দামের জিনিষ কোথা থেকে পাব?" লীলা তখন ভাব্‌লো যে, তার হাত খরচের টাকা জমিয়ে সে সেলাই বাক্স কিন্‌বে, কিন্তু হাত খরচ তো বেশী পায় না, দশ টাকা জমাতে ঢের দেরী হবে—তা যতই দেরী হোক্, সে ঠিক কর্‌লো যে টাকা জমাবেই। লীলা লজঞ্চুস আর কাঁচের পুতুল খুব ভালোবাস্‌তো কিন্তু টাকা জমাতে আরম্ভ করার পর থেকে, সে সব সখ ছেড়ে দিল। সে শোভার ভাই বোনদের জন্য সর্ব্বদা কিছু না কিছু নিয়ে যেত, এখন সে শোভাদের বাড়িতে যায় না, পাছে শোভার ভাই বোনেরা কিছু চায়, তাহলে ত টাকা খরচ হয়ে যাবে। কত সময়ে পথে শোভার সঙ্গে দেখা হয়, শোভা তাদের বাড়ী যেতে বলে, লীলা 'যাব" বলে কিন্তু যায় না,—কিছু না নিয়ে গেলেও ভালো লাগে না, অথচ দিতে গেলেই বা চলে কি করে? স্কুল থেকে আস্‌বার সময় রাস্তার ধারে একটি খোঁড়া ভিখারী বসে থাকে, লীলা তাকে রোজ একটা করে পয়সা দিত, আর ভিখারীও তাকে দূর থেকে দেখ্‌তে পেলেই হাস্‌ত। সে দিনও তাকে আস্‌তে দেখে ভিখারী হাস্‌তে লাগ্‌ল। লীলা একবার ভাব্‌ল "একটা পয়সাই তো, দিয়ে দিই।" তারপর আবার ভাব্‌ল, "রোজ একটা করে দিতে দিতে শেষকালে অনেক খরচ হয়ে যাবে।" পয়সা দেওয়া হ'ল না, ভিখারী ওর মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল। লীলারও মনে কষ্ট হ'ল, কিন্তু বাক্সটার উপরে তার খুবই লোভ ছিল, তাই সে মন শক্ত করে রইল—এরপর থেকে আর কখনও সেই রাস্তা দিয়ে সে বাড়ি ফির্‌ত না।

এমন করে যে দিন লীলার দশটি টাকা জম্‌ল, সেই দিন বিকালে বেড়াতে যাবার সময়ে সে তার টাকার থলিটি সঙ্গে নিল; ভাব্‌ল, ফির্‌বার সময় বাণীদের বাড়ি গিয়ে তাকে বল্‌বে ঐ রকম একটি বাক্স আনিয়ে দিতে। বেড়াতে বেড়াতে টাকাগুলো আর একবার গুণে নেবার জন্য, লীলা ঘাসের উপর বসে সেগুলো কোলে ঢাল্‌লো। টাকা গুণ্‌ছে, এমন সময় শোভার ছোট ভাই খোকা এসেই অবাক্ হয়ে বল্ল, "কত টাকা! লীলাদিদি, এত টাকা তুমি কোথায় পেলে?" লীলা তার কথার উত্তর না দিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা কর্‌লো, "খোকা, তোমার মুখ এমন শুখ্‌নো কেন? জলখাবার খেয়েছ?" ছেলেটি গম্ভীর হয়ে বল্ল, "না।"—"কেন? দিদি তোমাকে খেতে দেয়নি?"

খোকা কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, "না—দিদির কাছে পয়সা নাই।" তখন লীলার মনে কে যেন বল্ল, "দেখ্‌ছ না ওরা কত গরীব খেতে পায় না, তোমার টাকাগুলো ওদের দাও।" লীলা তার সমস্ত টাকা পয়সা খোকার হাতে দিয়ে বলল, "এইগুলো তোমার দিদিকে দাও, এই দিয়ে খাবার কিনে দেবে।" খোকা নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলে গেল, আর লীলাও খানিকক্ষণ কি ভাব্‌ল, তারপর বাড়ি চলে গেল। এত কষ্ট করে টাকা জমিয়েও বাক্স কেনা হ'ল না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তার জন্যে ত লীলার মনে বিশেষ কিছুই কষ্ট হচ্ছে না!

পরদিন স্কুলে যাবার সময়ে লীলা দেখ্‌ল, তার বইএর সঙ্গে সেই রকম একটা সেলাইএর বাক্স রয়েছে। সেটার হাতলের সঙ্গে একটা ছোট কাগজ বাঁধা, তাতে লেখা আছে—

"লীলা যে একটা খুব ভালো কাজ করেছে, তার পুরস্কার স্বরূপ তাকে এটা দিলাম ঠাকুরমা।"

ঠাকুরমা যে আবার তার গতিবিধি লক্ষ্য কর্‌ছেন তা লীলা জান্‌ত না। সেই থেকে লীলা বুঝ্‌ল যে, স্বার্থপরের মতন শুধু নিজের জন্য টাকা জমানর চেয়ে অন্যের কাজে লাগালেই বেশী সুখ!

অপরিবর্তিত

প্রথম প্রকাশ : চৈত্র ১৩৩০

অন্নদাশঙ্কর

রেবন্ত গোস্বামী

যখন শামলা গায়ে আমলারা সব সামলাতে দেশ পাগলপ্রায়,
তখন কাজের শেষে মুচকি হেসে কলম ধরেন এ. এস্ রায়।
লেখেন ইতিহাসে যাই লেখা থাক, জাপানের সেই দুর্দশা
করে ব্রিটিশ রুশি মেরিকা নয়, কেষ্‌নগরের বীর মশা।
বলেন তেলের শিশি ভাঙলে খুকুর পিঠে পড়ে চড়চাপড়;
তবু নেতা হয়ে মাল্য পরেন, ভাঙেন যারা দেশ ও ঘর।
ভাগ্যিস ভাগ করতে দেশ নদী বন করল তারা বিরাট ভুল;
তাইতো ভাগ হল না আলো হাওয়া রবিঠাকুর ও নজরুল।
বুঝি তাই সে খুকু খোকাদেরই জন্যে মজার ছন্দেতে
লেখেন মনমাতানো ছড়ার মালা দিলখোলা আনন্দেতে।
জানি বড়োরাও সব পড়েন যে তাঁর হালকা-ভারী নানা বই;
তবু ময়নার মার কুটুমবাড়ি- তাতে সে খোঁজ জানান কই!
অমন বেড়াল বাদুড় পাখির ছানা, মজারুদের রাজ্যেতে
আবার খোকারা সব খুকুরা সব পারবে কী আর আজ যেতে?
কারণ ঐরাবতের শেষ ছড়াতে লিখে দিয়েই 'সন্দেশ'-এ
হঠাৎ অন্নদা রায় চলে গেলেন ছন্দে গড়া কোন দেশে!

লাগালাগি

কিরণময় গঙ্গোপাধ্যায়

গরম লাগে শরম লাগে, লেপ লাগে যে শীতে
বিষম লাগে দুঃখ লাগে, উই লাগে যে ভিতে।
ভালোও লাগে ভয়ও লাগে, সুর লাগে যে গানে
আরাম লাগে শ্রমও লাগে, লাগল তালা কানে।
বুদ্ধি লাগে সাহস লাগে, লিখতে লাগে খাতা।
কষ্ট লাগে খারাপ লাগে, অঙ্কে লাগে মাথা।
লাগালাগির সংখ্যা বহু, অবাক শুধু লাগে—
ভালো লাগার কারণ কেন যায় না বোঝা আগে!

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

চিঠি

সৃজন পাল

মেঘ মুলুকে লিখবে চিঠি
মামন,
বৃষ্টি দে মেঘ, বুনব এবার
আমন।
কিন্তু চিঠি নিয়ে যাবে
কে,
লাট্টু ঘুড়ি তৈরি আছে
হে!
লাট্টু ঘুড়ি বুকপকেটে
চিঠি—
নিয়ে চলল মেঘ মুলুকে
ছুটি।
মেঘ রাজা কয়, 'খবর কী রে
পোলা?'
'মামন দিদির চিঠি আছে
ঝোলায়!'
'মামন দিদির চিঠি আছে
হুম্'
ভাঙিয়ে দে সব মেঘ ভালুকের
ঘুম—
জানিয়ে দে সব ডাকে দিয়েছে
মামন।
যেতেই হবে, এক্‌খুনি সব
নামন।'

গুর গুর গুর গামুর গুমুর
ঝামুর ঝুমর ঝামন।

আমার ঘর

রমিতা পাল সেনগুপ্ত

ছোট্ট আমার ঘর
নীল পাহাড়ের কোলের পরে অরূপ মনোহর
সবুজ মাটি পায়ের নীচে
আকাশ-পিতা দাঁড়ায় পিছে
আদর দিয়ে আরাম দিয়ে গড়তে আমার ঘর,
চোখ-জুড়ানো ছুটির ছবি অরূপ মনোহর।

আমার যে গান হারিয়ে গেছে
জানি সে সুর আছেই আছে
ওই ঘরেরই হাওয়ায় মিশে নিবিড় ছায়ায় ঢাকা
ওই ঘরে সব চুপ কথারাই সোনার আলোয় আঁকা।

হাওয়ায় যেদিন বাজায় বাঁশি বাদল মেঘের গান
ফেলে আসা ঘরে ফেরায় সেদিন লাগে টান।
ভেজা ফুলের গন্ধে আমার বন্ধ জানালায়
আলোয় ভেসে আলোর পাখি গায়
ঘর-খোঁজা মন, মনের মধ্যে গড়ে আমার ঘর
ছুটির দিনের আলোর সুরে অরূপ মনোহর।

কমান্ডার বোস

কল্পনা ও ছবি – গৌতম কর্মকার

কিছু একটা আসছে··
উফ, ওরা প্রচণ্ড ক্ষিপ্র
জি-জি-জি··
কী অদ্ভুত রশ্মি! শরীর শিথিল হয়ে আসছে· মাথাটা মনে··
মনে হচ্ছে ফেটে যাবে· উফ সব শেষ! আ-আ·
মুহূর্তে উঠে বসলেন সেকেন্ড কমান্ডার·
আ-হ- আমার কী হয়েছিল? মনে পড়েছে।
এইবার আমার পালা।
-ব্লিপ-
-ব্লিপ-
শয়তান মহাকাশ পোকা, তোমরা জানো না সেকেন্ড কমান্ডারের মৃত্যু নেই।

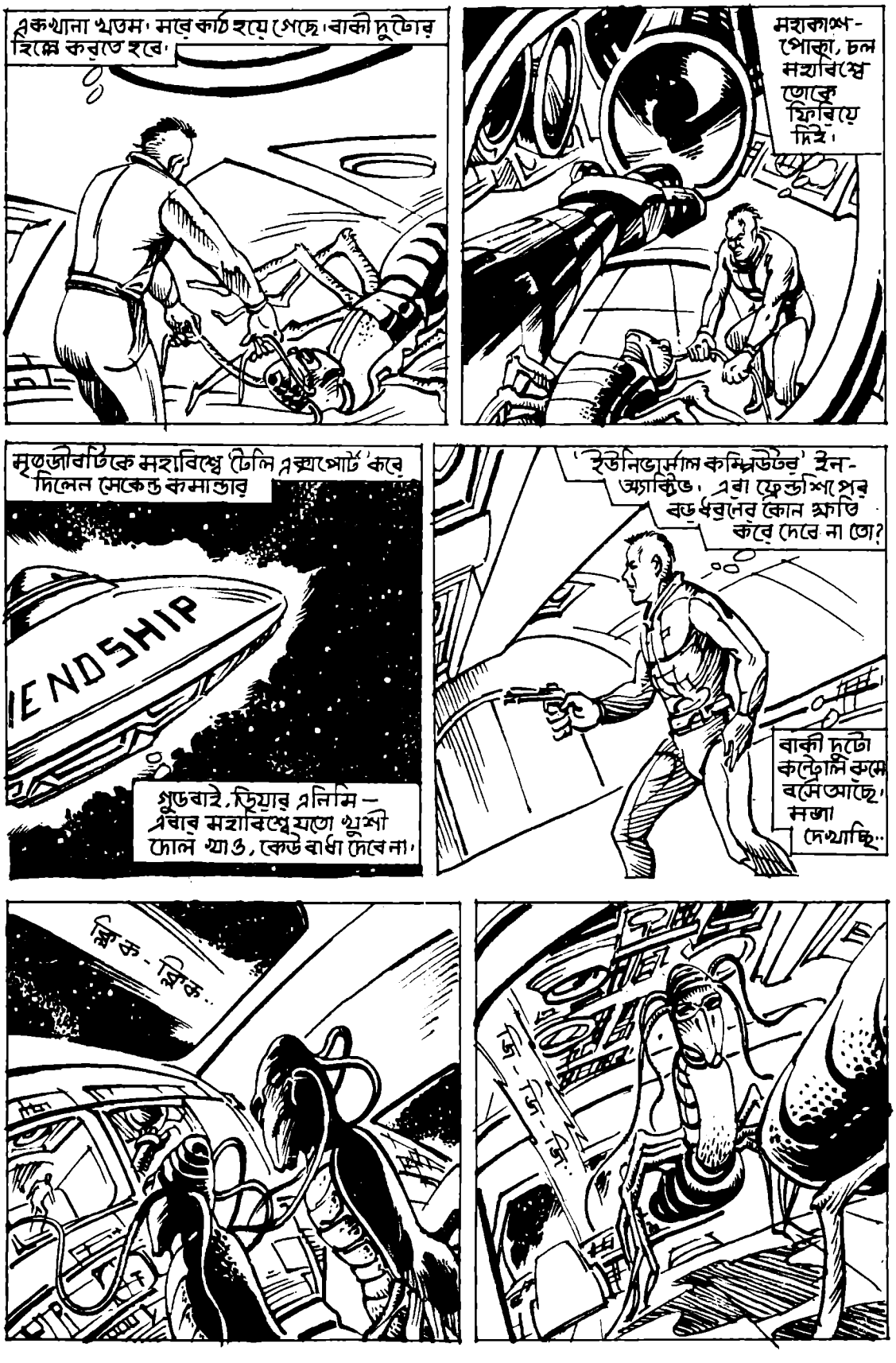

একখানা খতম। মরে কাঠ হয়ে গেছে। বাকী দুটোর হিল্লে করতে হবে।
মহাকাশ-পোকা, চল মহাবিশ্বে তোকে ফিরিয়ে দিই।
মৃতজীবটিকে মহাবিশ্বে 'টেলি এক্সপোর্ট' করে দিলেন সেকেন্ড কমান্ডার
FRIENDSHIP
গুডবাই, ডিয়ার এনিমি — এবার মহাবিশ্বে যতো খুশী দোল খাও, কেউ বাধা দেবে না।
'ইউনিভার্সাল কম্পিউটর' ইন-অ্যাক্টিভ। এরা ফ্রেন্ডশিপের বড় ধরনের কোন ক্ষতি করে দেবে না তো?
বাকী দুটো কন্ট্রোল রুমে বসে আছে। মজা দেখাচ্ছি..
ক্লিক - ক্লিক..
জি - জি - জি -

উফ্, কী অসম্ভব ক্ষিপ্র ওদের চালচলন!
জি - জি - জি
মাথার ভিতরটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। সারা শরীরে নামছে শীতল একটা স্রোত। কী অপূর্ব অনুভূতি!
চারপাশে এতো আলো কেন? লাল, নীল, হলুদ, সবুজ! আমি কে, কোথায় চলেছি? না-না এটা ঠিক নয় আমাকে যেতে হবে…
ঐ দূর মহাবিশ্ব আমাকে ডাকছে- আমাকে যেতে হবে।
এই আমাদের টেলি-এক্সপোর্ট এন্ড ইম্পোর্ট সিস্টেম। প্রোজেকসন প্ল্যাটফর্ম-এ দাঁড়াচ্ছি, ছোট ঐ সবুজ বোতাম গুলো টিপে দিলেই আমার ছুটি।
অন্ধকার মহাবিশ্বে একটুকরো গ্রহানুর মতো ঘুরে বেড়াবো চারিদিকে।
বন্ধনহীন কী মধুর জীবন।

ক্রমশ

প্রসাদরঞ্জন রায়

প্রায় ২০০ বছর আগে যখন এদেশে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা কায়েম হচ্ছে, তখন ভারত ছিল প্রকৃতির স্বর্গরাজ্য। দেশের শতকরা ৪০ ভাগেরও বেশি জমি ছিল ঘন বনে ঢাকা। উনিশ শতকের শেষে বিখ্যাত শিকারি ডানবার ব্র্যান্ডার বলেছেন যে, মধ্য ভারতে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা ছিল বিস্ময়কর—বিশ শতকের আফ্রিকার মতন ভারতের বনভূমি তখন প্রকৃতি-প্রেমিক ও অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় শিকারিদের হাতছানি দিত।

আর আজ? গত একশো বছরে জনসংখ্যা যেমন বেড়েছে, সভ্যতাও থাবা বাড়িয়েছে বন-জঙ্গলের বুকে—স্বাভাবিকভাবেই পিছু হটেছে আরণ্যক প্রাণী আর উদ্ভিদগোষ্ঠী। ১৯৫২ সালে বননীতিতে বলা হয়েছিল যে স্থলভাগের শতকরা ৩৩ ভাগকে আনতে হবে বনভূমির আওতায়। সে জায়গায় এতদিনের চেষ্টায় সরকারি হিসেবে বন বলে চিহ্নিত জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মাত্র শতকরা ২৩ ভাগ, আর তার মধ্যে মাত্র অর্ধেক জমিতে ঘন বন আছে। সাম্প্রতিককালে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে—তবু শুধুমাত্র নব্বইয়ের দশকেই আমরা হারিয়েছি প্রায় ৫৫ লক্ষ হেক্টর বনভূমি।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 'বায়োডাইভারসিটি' বা জৈব বৈচিত্র্যের ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। যদিও ভারতের আয়তন পৃথিবীর তুলনায় মাত্র শতকরা ২ ভাগ, পৃথিবীর জৈব বৈচিত্র্যের শতকরা ৮ ভাগ পাওয়া যায় এখানে। কিন্তু শতকরা ২ ভাগ জমিতে যেমন শতকরা ৮ ভাগ জৈব বৈচিত্র্য আছে, তেমনি আছে পৃথিবীর শতকরা ১৬ ভাগ জনসংখ্যা, আর শতকরা ২০ ভাগ গবাদি পশুর চাপ। অর্থাৎ পরিবেশের ধারণ-ক্ষমতার উপর চাপ প্রচণ্ড আর তা ক্রমশই বাড়ছে। গরিব মানুষ অনেক সময়েই নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে পরিবেশের ক্ষতি করতে বাধ্য হয়। এর ফলে গজিয়ে ওঠে বিপন্ন এলাকা, যাকে পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা বলেন 'বায়োডাইভারসিটি হট-স্পট'। সারা পৃথিবীতে এরকম ১৮টি 'হট-স্পট' বিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করেছেন, তার মধ্যে দুটি ভারতে : পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশ আর পশ্চিমঘাট পর্বতমালা।

বিশ্ব প্রকৃতি সংরক্ষণ সংস্থার (IUCN) তরফে Species Survival Commission বিভিন্ন প্রজাতির পরিস্থিতির উপর নজরদারি করেন। এর ভিত্তিতে তাঁরা বিপন্ন প্রাণীর ও উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ করেন আর তা *Red Data Book*'এ প্রকাশ করেন। ২০০০ সালে যে *Red Data Book* প্রকাশিত হয় তাতে সারা পৃথিবীতে ৮০৮টি প্রজাতি অবলুপ্ত আর প্রাণী ও উদ্ভিদ মিলিয়ে ১১,০৩৯টি প্রজাতি বিপন্ন। এর মধ্যে ভারতেই বিপন্ন ৩৫৫টি প্রজাতি। ভারতের চেয়ে বিপন্ন প্রজাতির সংখ্যা বেশি কেবল সাতটি দেশে। অবশ্য সমীক্ষার কাজ আরও ভালোভাবে হলে অমেরুদণ্ডী প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা অনেক বাড়তে পারে।

গত ১০০ বছরে ভারতে বড়ো স্তন্যপায়ী জন্তুর মধ্যে চার-চারটি প্রজাতি স্থানীয়ভাবে অবলুপ্ত।

(১) **চিতা** : আফ্রিকার বাইরে পশ্চিম এশিয়া আর ভারতের মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলে পাওয়া যেত। সম্রাট আকবর শিকারে ব্যবহার করতেন ৬০০০ পোষা চিতা, ভারতের রাজা-রাজড়ারা বিশ শতকেও তাঁকে অনুসরণ করে গেছেন। চিতা অনেক দেখা যেত পঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ ও মহীশূরে। কিন্তু গত শতকে ক্রমশ বিরল হয়ে আসে। ১৯৪৭ সালে সরগুজার মহারাজা একদিনে তিনটে চিতা মারেন, তারপর থেকে আর দেখা যায় নি। এখন আফ্রিকায় আছে হাজার দশেক, ইরানে শ'দুয়েক আর ভারতে কেবল কিছু স্মৃতি।

(২) **সুমাত্রার গণ্ডার** : আফ্রিকার বাইরে একমাত্র দ্বিশৃঙ্গ গণ্ডার। ১৯ শতকের শেষেও সুমাত্রা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে আরাকান পাহাড়, চট্টগ্রাম ও উত্তর-পূর্ব ভারতে পাওয়া যেত। বর্তমানে ভারতে অবলুপ্ত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গুরুতর বিপদগ্রস্ত, সংখ্যায় ৫০০'রও কম।

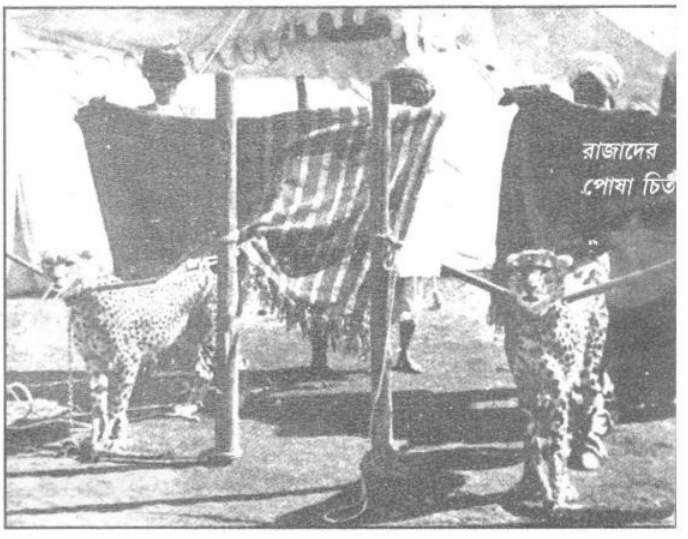
রাজাদের পোষা চিতা

(৩) **জাভার গণ্ডার** : ভারতীয় একশৃঙ্গ গণ্ডারের তুলনায় আকারে ছোট। ১৯ শতকে জাভাদ্বীপ ছাড়াও পাওয়া যেত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আসাম আর বাংলায় সুন্দরবন অঞ্চলে। শুধু সুন্দরবনই নয়, ১৮১৮ সালে ব্যারাকপুরের কাছে একটা গণ্ডার মারা হয়, সম্ভবত সেটা ছিল জাভার গণ্ডার। আজ কথাটা বিশ্বাস হয়? বর্তমানে সম্পূর্ণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেই এই গণ্ডার অত্যন্ত বিপন্ন, মোট

সাহেবদের ১৫ দিনের শিকার

সংখ্যা ৭০-এরও কম, বিশেষজ্ঞদের মতে এর অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী।

(৪) **বান্টেং** : জাভার ছোট আকারের লালচে রঙের বুনো মহিষ। আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব ভারতে মণিপুর অঞ্চলে পাওয়া যেত। গত পঞ্চাশ বছরে ভারতের চৌহদ্দির মধ্যে দেখা যায় নি।

ভারতের বন্যপ্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাঘ। বাঘ আমাদের জাতীয় পশুও বটে। ১৯ শতকের গোড়ায় এদেশে বাঘের সংখ্যা ছিল একলক্ষ, ১৯২০ সালে তা

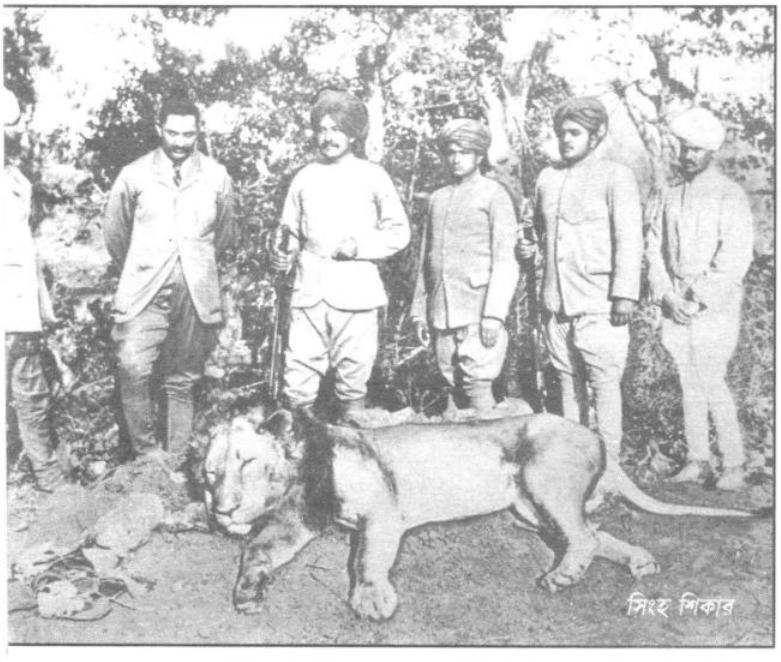

সিংহ শিকার

দাঁড়ায় ৪০,০০০'এ, আর ১৯৭২ সালের বাঘসুমারিতে ধরা পড়ে মাত্র ১,৮০০। বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত ছিলেন যে বাঘ অবলুপ্তির মুখে। কিন্তু বিশ্ব বন্যপ্রাণী তহবিলের চেষ্টায় আর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উদ্যোগে 'প্রোজেক্ট টাইগার' শুরু হয়। ১৯৯৮ সালের বাঘসুমারিতে সংখ্যাটা বেড়ে ৩,৭৫০'এ দাঁড়ালেও নিঃসন্দেহে বাঘ আজও বিপন্ন। প্রসঙ্গত বলা যায় পৃথিবীতে বাঘের আটটি উপপ্রজাতির মধ্যে তিনটি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। অন্য পাঁচটি প্রজাতির মধ্যে দক্ষিণ চিনের বাঘ, সাইবেরিয়ার বাঘ, সুমাত্রার বাঘ আর ইন্দোচিনের বাঘ সংখ্যায় কম। কেবল ভারতীয় বাঘ বা রয়াল বেঙ্গলের সংখ্যাই হাজার পাঁচেক। সুতরাং, সারা পৃথিবীর নিরিখেও 'রয়াল বেঙ্গল' সংরক্ষণের গুরুত্ব খুবই বেশি।

বাঘের প্রসঙ্গ উঠলেই বাঘ শিকারিদের কথাও এসে যায়। পুরোনো ছবিতে দেখা যায় বাঘবাবাজি ইহলীলা সংবরণ করেছেন, আর তাঁর দেহের পাশে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে বীর শিকারিরা, তাঁদের চারধারে চাকর, খানসামা, পাইক, বরকন্দাজ বা বিটাররা। জিম করবেট অবশ্যই মানুষখেকো বাঘ শিকার করতেন, অনেক সময়েই পায়ে হেঁটে। কিন্তু অন্যান্যরা? সদলবলে মাচানে বসে কিংবা হাতিতে চড়ে শিকার করাতেই অধিকাংশের আনন্দ। এক চিঠিতে সরগুজার মহারাজা সগর্বে বলেছেন তাঁর শিকার করা বাঘের সংখ্যা ১১৫০, জয়পুরের মহারাজা নাকি ১০০০ ছাড়িয়েছেন, গোয়ালিয়রের মহারাজা ৭০০! সাহেবদের মধ্যে রেকর্ড সম্ভবত ইউল সাহেবের, ২৫ বছরে তিনি বাঘ মেরেছেন ৪০০। কর্ণেল নাইটিঙ্গেল মেরেছেন ৩০০, মন্টেগু জেরার্ড সাহেব ২২৭, বিখ্যাত আফ্রিকান শিকারি গর্ডন কামিং এক গ্রীষ্মেই ৭৩। তালিকার শেষ নেই। এমনকি ১৯২১ সালে ইংল্যান্ডের যুবরাজের প্রমোদ-ভ্রমণে সাত দিনে বাঘ মারা হয়েছে ১৭টি। বাঘ-সিংহকে হিংস্র জন্তু বলা হয় কিন্তু কুখ্যাত চম্পাবতের মানুষখেকোর শিকারের সংখ্যা ৪৩৬ আর সরগুজার ওই মহারাজের ১১৫০। তাহলে হিংস্র কে?

বাঘ ছাড়াও ভারতে পাওয়া যায় এশিয়ার সিংহ। আফ্রিকার বাইরে সিংহ পাওয়া যেত দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে আর পশ্চিম ও দক্ষিণ এশিয়াতে। ইউরোপে আর পশ্চিম এশিয়ায় সিংহ অবলুপ্ত হয়ে গেছে, কেবল টিকে আছে গুজরাটের গির অরণ্যে। অথচ ১৯ শতকেও সিংহ পাওয়া যেত সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারতে। শেষ সিংহ শিকারের রেকর্ড এই রকম : বিহার (১৮১৪), দিল্লি (১৮৩৪), সিন্ধ ও বাহাওয়ালপুর (১৮৪২), বিন্ধ পর্বত ও বুন্দেলখণ্ড (১৮৬৫), মধ্য ভারত (১৮৭০), রাজস্থান ও আরাবল্লি পাহাড় (১৮৮০)। ১৯ শতকের শেষে গির অঞ্চলে কোনক্রমে টিকে ছিল ডজন খানেক সিংহ। সৌভাগ্যবশত জুনাগড়ের নবাব তাঁর খাস তালুক গিরে অভয়ারণ্য ঘোষণা করেন, শিকার বন্ধ হয়। আজ গিরে সিংহের সংখ্যা প্রায় ৩০০। সেখানেও জায়গার সমস্যা, গোপালক মালধারীদের সঙ্গে সমস্যা লেগেই আছে। কিছু সিংহ অন্যান্য সংরক্ষিত অঞ্চলে সরিয়ে দেওয়ার কথা হচ্ছে। তবু ভারতীয় সিংহ আজও অত্যন্ত বিপন্ন।

অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীর মধ্যে নিঃসন্দেহে বিপদগ্রস্ত তুষার-চিতা। ভারতে আছে মাত্র শ'খানেক। আন্তর্জাতিক চোরাবাজারে প্রায় তুষার-চিতার মতনই চামড়ার চাহিদা (দাম ৫০০ ডলার) উত্তর-পূর্ব ভারতে 'ক্লাউডেড

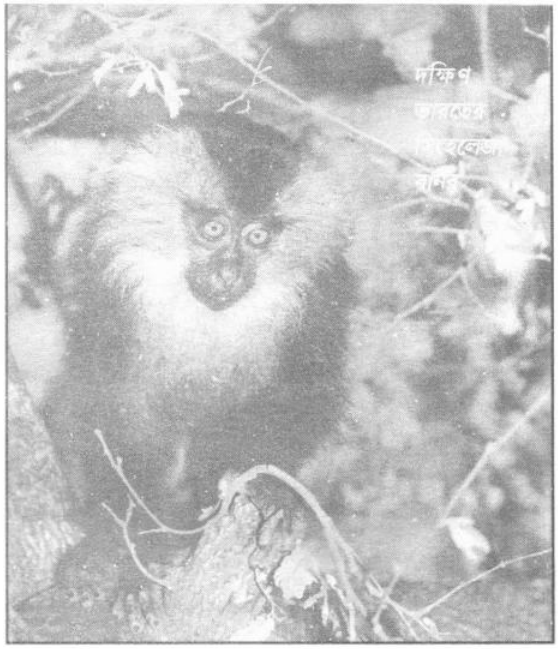

লেপার্ড এর। প্রায় একই কারণে বিপন্ন বিভিন্ন প্রজাতীর বনবিড়াল—'মার্বল্ড ক্যাট', 'গোল্ডেন ক্যাট', 'ফিশিং ক্যাট', রাজস্থানের 'সিয়াগোশ' আর কাশ্মীরের 'লিংক্স'। প্যান্থার বা চিতা বাঘের সংখ্যা তেমন বিপজ্জনকভাবে কমেনি ঠিকই কিন্তু প্রায়ই খবরের কাগজে বেরোয় চোরা শিকারের কথা এবং মাঝে মাঝে চিতাবাঘের চামড়া ধরা পড়ার কথা। আমরা কী জানি কটা চিতাবাঘ মারা পড়লে একটার চামড়া ধরা পড়ে পুলিশ বা বনবিভাগের হাতে?

কুকুর-গোষ্ঠীর প্রাণীদের মধ্যে বিপদের যথেষ্ট সম্ভাবনায় আছে নেকড়ে আর বুনো কুকুর বা ঢোল—দুটিই কিপলিং-এর গদ্যে অমর হয়ে অছে। হায়না, এমনকি শেয়ালও অনেক কম দেখা যায় আজকাল। ভালুক-গোষ্ঠীর প্রাণীদের মধ্যে বিপন্ন হিমালয়ের কালো ভালুক (যার গলায় হাঁসুলির মতন সাদা লোম), এমনকি আমাদের সাধারণ ভালুক বা 'শ্লথ বেয়ার' (যা নিয়ে ভালুকওয়ালারা খেলা দেখায়)। রীতিমতন বিরল হিমালয়ের 'রেড পাণ্ডা'; বিপন্ন উত্তর-পূর্ব ভারতের 'বিন্টুরং', 'স্পটেড লিনসাং' আর 'হগ ব্যাজার'; এবং দক্ষিণ ভারতের 'নীলগিরি মার্টেন' আর 'মালাবার সিভেট'।

তৃণভোজী প্রাণীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গবাদি পশু—ভারতে এই গোষ্ঠীর তিনটি প্রজাতি পাওয়া যায়, তার মধ্যে দুটি (বনমহিষ আর বন্য ইয়াক) বিপদগ্রস্ত আর অন্যটি (গৌর বা ভারতীয় বাইসন) বিপদের সম্ভাবনায়। বর্তমানে বুনোমহিষ মধ্যপ্রদেশের বস্তার অঞ্চল ও আসাম ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না, এদের মোট সংখ্যা ১০০০-১৫০০। বুনো ইয়াকের সংখ্যা আরও অনেক কম, ভারতের চৌহদ্দির মধ্যে ১০০টাও টিকে আছে কিনা সন্দেহ। গৌর অবশ্য ভারতে বেশ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পাওয়া যায়, সংখ্যায় হাজার দশেক হবে। অধিকাংশেরই বাস অভয়ারণ্যে, তবুও এরা সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত নয়। বুনো ছাগল বা ভেড়ার প্রত্যেকটি প্রজাতিই আজ বিপন্ন। লাদাখের 'শাপু' বা 'উরিয়াল',

দক্ষিণ ভারতের সিংহলেজা বাঁদর

'নায়ান' আর মার্কো পোলোর ভেড়া, হিমালয়ের 'ভরাল', 'আইবেক্স' (সংখ্যায় ৭০০-১২০০), 'মার্খোর' (সংখ্যায় ২৫০-৩০০) ও 'টাহর', আর দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি টাহর (সংখ্যায় হাজার দুয়েক, কিন্তু নীলগিরি আর আনাইমালাই পাহাড় বাদে অন্যত্র বিরল)। 'গোট-অ্যান্টিলোপ' গোষ্ঠীর মধ্যে বিরল উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলের সেরাও আর টাকিন (বর্তমানে অরুণাচলের সিয়াং অঞ্চল ছাড়া অন্যত্র দেখাই যায় না); তুলনায় গোরালের দুটি উপ-প্রজাতি কিছুটা স্বস্তিতে আছে। অ্যান্টিলোপ গোষ্ঠীর প্রাণীর মধ্যে অত্যন্ত বিপন্ন কৃষ্ণসার বা 'ব্ল্যাকবাক' যাদের কিছুকাল আগেও উত্তর ও মধ্য ভারতে দেখা যেত ১৫-২০ হাজারের দলে আর আজ সারা দেশে মাত্র কয়েক হাজার টিকে আছে; মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের 'চৌশিঙ্গা' (সংখ্যায় বড়োজোর ৫০০০); আর উত্তর ও মধ্য ভারতের 'চিংকারা' (সংখ্যায় ২০০০-এরও কম)। নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বিপন্ন চিরু বা তিব্বতী অ্যান্টিলোপ—ভারতে লাদাখ উপত্যকায় খুব কমই আছে কিন্তু 'শাহতুষ' শাল তৈরির জন্য চিন থেকে চিরুর পশম চোরাচালানে আসে (অনুমানে তিব্বতে বছরে ১০,০০০ মারা পড়ে)। বর্তমানে অবশ্য 'শাহতুষ' বাণিজ্য বন্ধ করা হয়েছে। হরিণ-জাতীয় প্রাণীর মধ্যে চিতল, সম্বর, কাকার বা 'বার্কিং ডিয়ার' আর 'হগ ডিয়ার'এর সংখ্যা এখনো পর্যাপ্ত

চোরাই হাতির দাঁত

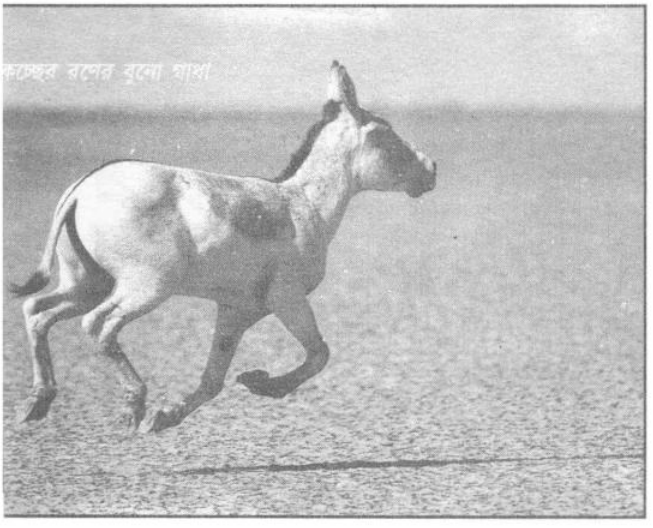

কিন্তু গুরুতর বিপদগ্রস্ত মণিপুরের 'নাচুনি হরিণ' বা 'থামিন'—মুক্ত অবস্থায় কেবল মণিপুরের লোকটাক হ্রদে ৫০টা আছে, অবশ্য চিড়িয়াখানায় আছে বেশ কিছু। এছাড়াও বিপদগ্রস্ত কাশ্মীরের 'হাঙ্গুল' বা 'কাশ্মীর স্ট্যাগ' (বর্তমানে মাত্র একটি অভয়ারণ্যে পাওয়া যায়) আর কস্তুরী মৃগ (মুক্ত অবস্থায় সংখ্যা রীতিমত কম)। ভারতে দুরকমের বুনো গাধা পাওয়া যায়, দুটিই বিপন্ন—কচ্ছের রণ অঞ্চলের ঘোড়খুর (সংখ্যায় ১০০০-এর কম) আর লাদাখের কিয়াং (সংখ্যায় মাত্র কয়েকশ)। শূয়র গোষ্ঠীর প্রাণীর মধ্যে ভুটান ও আসামের পিগমি হগ। ই, পি, জী সাহেব পুনরাবিষ্কার করেছিলেন ১৯৫১ সালে, আজও তা অত্যন্ত বিরল ও গুরুতর বিপদগ্রস্ত।

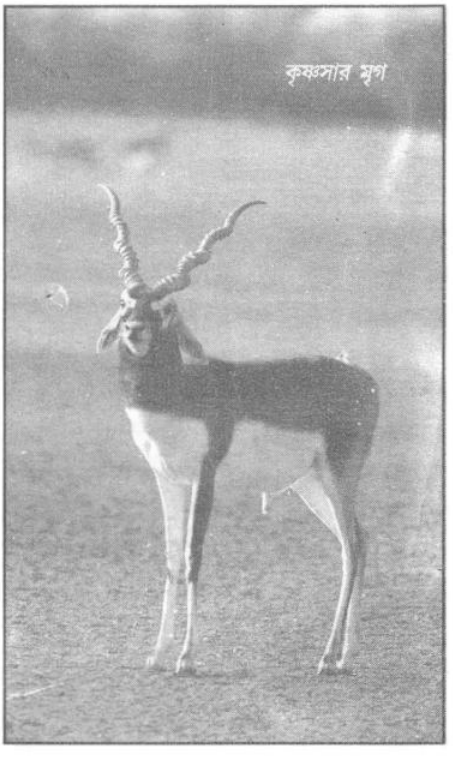

ভারতের বৃহত্তম স্থলচর প্রাণী নিঃসন্দেহে ভারতীয় হাতি আর একশৃঙ্গ গণ্ডার। ব্রিটিশরাই এদেশে হাতি শিকার আরম্ভ করে, অবশ্য আফ্রিকার হাতির তুলনায় আমাদের হাতির দাঁত অনেক ছোট বলে আফ্রিকার মতো ব্যাপক হারে হস্তীসংহার পর্ব এদেশে চলে নি। তবু পঞ্চাশ বছর আগে ভারতে অন্তত ৫০,০০০ হাতি ছিল, আজ তা ২০,০০০-এরও কম। বাজারে হাতির দাঁতের দাম এখন কিলো পিছু প্রায় ৩০০ ডলার, গবেষকদের মতে তাই দক্ষিণ ভারতে বছরে ৪০-৫০টা হাতি মারা পড়ে। বিখ্যাত চন্দনদস্যু বীরাপ্পন আর তার দলবল নাকি ১০০০-টারও বেশি হাতি শিকার করেছে। তবু চোরাশিকারের থেকেও হাতির বড়ো শত্রু জনসংখ্যার চাপ—বন কেটে বসত, ন্যাড়া বনে খাদ্যের অভাব, বাধ্য হয়ে হাতির ফসল ক্ষেতে প্রবেশ এবং তাদের চলাচলের পথে বাধা। ইদানীং দলমার হাতি বারবার বর্ধমান, হুগলী এমনকি কলকাতার কাছাকাছি চলে আসছে তার মূল কারণ এই। হাতির পরে একশৃঙ্গ গণ্ডার। ভারতীয় গণ্ডার আগে পাওয়া যেত সমগ্র উত্তর ভারতে—বাবর গণ্ডার শিকার করেছেন সিন্ধু নদের কাছে। ১৯ শতকে ফসল নষ্ট করার অজুহাতে গণ্ডার মারলে ২০ টাকা পুরস্কার পাওয়া যেত। তার ফলে গণ্ডার আজ সীমাবদ্ধ কেবল নেপালে গোটা দুয়েক জঙ্গলে, আসামের চারটি অভয়ারণ্যে আর উত্তর বাংলার জলদাপাড়া ও গরুমারায়, সব মিলিয়ে সংখ্যায় ১,৫০০ হবে। কোচবিহারের মহারাজা তাঁর বইতে একঘেয়ে ভাবে লিখে গেছেন শিকার-কাহিনি—৩৭ বছরে তাঁর মোট সংগ্রহ ৩৬৫টা বাঘ, ৩১১টা চিতাবাঘ, ৪৩৮টা বুনোমহিষ আর ২০৭টা গণ্ডার। ১৮৮৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি লাঞ্চের আগেই রসিকবিল অঞ্চলে ৫টা গণ্ডার মারেন, আজ সেখানে একটিও গণ্ডার অবশিষ্ট নেই। প্রকৃতিবিদ আরমাঁ দেনিস তাঁর *On Safari* বইতে লিখেছেন : নেপালের মহারাজার বাইরের ঘরে গোটা চল্লিশ গণ্ডারের মাথা সাজানো ছিল, প্রাণীটি অত্যন্ত বিপন্ন জেনে মহারাজা বলেন যে কটা টিকে আছে তাতেই তাঁর শিকারের প্রয়োজন মিটে যাবে।

অন্যান্য বিপন্ন স্তন্যপায়ী প্রজাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভারতের একমাত্র 'এপ' উল্লুক—ত্রিশ বছর আগেও আসামে ৭০-৮০ হাজার উল্লুক ছিল, বর্তমানে তা লক্ষ্যণীয়ভাবে কমেছে। অন্যান্য বিপন্ন বানর প্রজাতির মধ্যে আছে দক্ষিণ ভারতের 'সিংহ-লেজা বানর' (সংখ্যায় ২,০০০-এরও কম) এবং নীলগিরি হনুমান (সংখ্যায় খুব জোর ৫০০) আর উত্তর-পূর্ব ভারতের 'সোনালি হনুমান'

(১৯৫১ সালে আবিষ্কৃত, বর্তমান সংখ্যা ৩০০), 'টুপিওয়ালা হনুমান', 'বেঁড়ে-লেজ বানর' আর 'লাজুক বানর'। এছাড়াও বিপন্ন ত্রিবাঙ্কুরের ও নামডাফার উড়ুক্কু কাঠবেড়াল, উত্তর-পূর্ব ভারতের 'হিসপিড হেয়ার', মধ্য ভারতের 'বনরুই' বা 'প্যাঙ্গোলিন' আর জলচর প্রাণীর মধ্যে গঙ্গার শুশুক আর ভারত মহাসাগরের 'ডুগং'।

ভারতে পাখি প্রজাতির সংখ্যা ১২২৪। গত ১০০ বছরে অবলুপ্ত হয়েছে অন্তত দুটি পাখি—'পিঙ্ক হেডেড ডাক' আর 'মাউন্টেন কোয়েল'। প্রথমটি সারা পূর্ব ভারতে দেখা যেত, শেষবার দেখা গেছে দ্বারভাঙায় ১৯৩৫ সালে। এখন শুধু জাদুঘরে কিছু পালক রাখা আছে। দ্বিতীয়টি হিমালয় অঞ্চলে ৫-৬ হাজার ফুট উচ্চতায় দেখা যেত, শেষবার দেখা গেছে ১৮৭৬ সালে নৈনিতালের কাছে। নিঃসন্দেহে বর্তমানে অবলুপ্ত।

তেমনি হারিয়ে আবার ফিরে পাওয়া গেছে তিনটি প্রজাতি—'জার্ডনস কোর্সার', 'ফরেস্ট স্পটেড আউলেট' আর 'হোয়াইট ব্রাওড বুশচ্যাট'। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে গবেষকরা খুঁজে বার করেছেন এই তিনটি প্রজাতিকে যথাক্রমে গোদাবরী উপত্যকা, মহারাষ্ট্রের ধুলে অঞ্চল আর রাজস্থানের থর মরুতে। অবশ্য পুনরাবিষ্কৃত হলেও এগুলি এখনও বিপন্ন। আরও আনন্দের কথা, ১৯৯১ সালে ভারত নেপাল সীমান্তে একটি নতুন

হারানো পাখি : জার্ডনের কোর্সার

প্রজাতির পাখি (Pnoepygia immaculata) আবিষ্কার করেছেন দুই সাহবে। এসব শুভ সংবাদ সত্ত্বেও পাখিদের জগতে সমস্যা অনেক।

শিকার ছাড়াও পাখির প্রধান সমস্যা পরিবেশের পরিবর্তন আর পাখি ধরা। সত্তরের দশকেও প্রতিবছর ভারত থেকে ৫/৭ লাখ পাখি রপ্তানি হত, এখন তা বে-আইনি কিন্তু চোরাচালান বন্ধ হয় নি। TRAFFIC INDIA একটি সমীক্ষায় দেখেছেন যে দেদার খাঁচার পাখি বিক্রি হচ্ছে, এর মধ্যে অনেকই বিপন্ন প্রজাতি। পাখির ব্যবসার একটা বড়ো সমস্যা এই যে পাখি ধরা থেকে তা খাঁচায় পোষা পর্যন্ত শতকরা ৭৫ ভাগই মারা যায়। পরিবেশ দূষণ আর জলাভূমি ভরাট করার প্রভাবও বিশাল। জলাভূমি কমার ফলে বেশকিছু জলচর প্রাণী আজ বিপন্ন। সাইবেরিয়ান ক্রেন ভরতপুরের জলায় শীত কাটাতে এখন আর প্রায় আসেই না। সম্প্রতি শকুনের সংখ্যা কমে গেছে বলে বেশ শোরগোল হচ্ছে—শুধু শকুন নয়, পেঁচা, চিল, বাজ, ঈগল সমস্ত মাংসাশী পাখির সংখ্যাই কমে এসেছে। পঞ্চাশের দশকে এরকম দেখা গিয়েছিল ইউরোপে—দেখা গেল ডিডিটি ব্যবহার এর জন্য দায়ী।

গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড

ডিডিটি মাংসাশী পাখিদের শরীরে জমে যায়, ফলে তাদের ডিমের খোলা পাতলা হয়ে যায়, অনেক ক্ষেত্রেই ডিম ফোটে না। ভারতে কিন্তু এখনও ডিডিটির ব্যবহার অপরিমিত। ভারতে বিপন্ন পাখির সংখ্যা এত বেশি যে তালিকা দীর্ঘায়িত করে লাভ নেই। নানা কারণে উল্লেখযোগ্য আন্দামানের চখা, অরুণাচলের 'হোয়াইট উইংড উড ডাক', উত্তর ভারতের শিকরা, শাহীন ও লগ্‌গর বাজ, হিমালয়ের স্বর্ণ ঈগল, নিকোবরের 'মেগাপোড', ফেজ্যান্ট গোষ্ঠীর প্রায় সবকটি,। 'গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড', নিকোবরের পায়রা, 'মালাবার হর্নবিল', 'স্পটবিল পেলিকান' ও আরও অনেক প্রজাতি।

বিপদের ঢেউ লেগেছে সরীসৃপ গোষ্ঠীতেও। ভারতে কুমির গোত্রের তিনটি প্রজাতিই বিপন্ন—ঘড়িয়াল, নোনাজলের কুমির আর মিঠে জলের কুমির বা মগর। অবশ্য সম্প্রতি কুমির প্রকল্পের পর কয়েক হাজার কুমির আবার তাদের প্রকৃতিক বিচরণ ক্ষেত্রে ছাড়া হয়েছে। সামুদ্রিক কাছিমের প্রত্যেকটি প্রজাতি ('লগারহেড',

'লেদারব্যাক', 'অলিভ রিডলি', 'হক্সবিল' ইত্যাদি) বিপন্ন তাদের খোলা, মাংস ও ডিমের জন্য। উড়িষ্যার গহিরমাথা সমুদ্র সৈকতে এখনও বছরে প্রায় ৫ লক্ষ 'অলিভ রিডলি' আসে ডিম পাড়তে আর তখন রক্ষণব্যবস্থা সত্ত্বেও মারা পড়ে অনেকগুলি। চামড়ার জন্য বিপন্ন বিভিন্ন প্রজাতির গোসাপ, অজগর ও অন্যান্য সাপ। ১৯৫৫ সালে ৫৫ লক্ষ কুমির, সাপ ও গোসাপের চামড়া রপ্তানি হয়েছিল ভারত থেকে, এখন অবশ্য এ ব্যবসা বন্ধ। খাদ্য হিসেবে ব্যাঙ রপ্তানি হচ্ছিল ইউরোপ ও দূরপ্রাচ্যে, কয়েকটি প্রজাতির ব্যাঙের সংখ্যা দারুণ কমে গেছে।

এই বিরাট তালিকার পরেও বলা দরকার যে মাছ, অমেরুদণ্ডী প্রাণী এবং উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই তালিকা অনেকটাই অসম্পূর্ণ। 'ট্রফি' হিসেবে বড়ো জন্তু ছাড়াও মাংস, ডিম, ছাল-চামড়া, খোলা, পালক, হাতির দাঁত, মহিষের শিং, গণ্ডারের খড়্গ—সবকিছুই শিকারের কারণ। সম্প্রতি জানা গেছে বাঘের হাড় থেকে শুরু করে গোঁফ, লোম, নখ, রক্ত, মাংস সবই লাগে চিনা ওষুধ তৈরি করতে আর এটাই সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান ও হংকং-এর ওষুধের কারখানাগুলিই বাঘ মারা পড়ার মূল কারণ। ১৯৭২ সালের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন আর ১৯৭৫ সালের বিপন্ন প্রাণী নিয়ে বাণিজ্য বন্ধের চুক্তি (CITES) অনুসারে অবশ্যই এসব নিষিদ্ধ কিন্তু চোরা শিকার চলছেই। আইন ভালো, কিন্তু আইন আমরা পুরোপুরি প্রয়োগ করতে পারছি কই? বাস্তবে অবশ্য চোরাশিকারের থেকে প্রাণী সম্পদের বেশি ক্ষতি হয়েছে পরিবেশ দূষণ এবং বনভূমি ও জলাভূমির বিনাশে।

বিপন্ন প্রজাতি বাঁচাতে অবশ্যই প্রয়োজন সংরক্ষিত এলাকা। ভারতে সম্রাট অশোক প্রথম অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ২৫০০ বছর আগে, আমরা সেকথা ভুলেই

বুনো মহিষ

হায়না

গিয়েছিলাম। মোগল সম্রাটরা শিকারি হিসেবেই নাম কিনেছিলেন—জাহাঙ্গীর একাই মেরেছেন ১৭,০০০ পশু ও ১৪,০০০ পাখি। বর্তমান শতকে যখন বন্যপ্রাণীর অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে তখন কয়েকজন রাজা-রাজড়ার নিজস্ব 'হান্টিং ব্লকে' গড়ে ওঠে সংরক্ষিত এলাকা—যেমন গির, ডাচিগাম, সিমলিপাল, শিবপুরী বা ভরতপুর। ১৯৩৫ সালে জিম করবেটের প্রিয় কুমায়ুনে গড়ে ওঠে প্রথম জাতীয় উদ্যান 'হেইলি ন্যাশনাল পার্ক' (বর্তমানে করবেটের নামাঙ্কিত)। ১৯৭২ সালের পরে গুরুত্ব আরও বাড়ে। ১৯৭২ সালে ভারতে ছিল ৫টি জাতীয় উদ্যান ও ৬০টি অভয়ারণ্য, ১৯৯২ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৯টি জাতীয় উদ্যান ও ৪১০টি অভয়ারণ্য (মোট আয়তন ১১৬,০০০ বর্গ কিমি)। গুণগত বিচারেও অনেক উন্নতি হয়েছে। ধাপে ধাপে ১৯টি অভয়ারণ্যে 'টাইগার রিজার্ভ' গড়ে তোলা হয়েছে। বিশেষ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে হাতি, কুমির, সিংহ, বুনো গাধা, কৃষ্ণসার, কাছিম আর বিভিন্ন ধরণের পাখির জন্য। বিশেষ পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য গড়ে উঠেছে ১২টি 'বায়োস্ফিযার রিজার্ভ' : নন্দাদেবী, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স, মানস, কাজিরাঙ্গা, নোকরেক (গারো পাহাড়), নামডাফা, সুন্দরবন, কানহা, থর মরু, নীলগিরি, মান্নার উপসাগর আর আন্দামানের 'নর্থ আইল্যান্ড'-এ।

এসব সত্ত্বেও আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি? কতগুলি অভয়ারণ্য অত্যন্ত ছোট, বিজ্ঞানীদের মতে বড়ো জন্তুর বিচরণক্ষেত্রের প্রয়োজনে অপ্রতুল। বহু ক্ষেত্রেই আশপাশের মানুষের সঙ্গে সংঘাত বাধছে চারণভূমির অধিকার ও গাছ কাটা নিয়ে। উত্তর-পূর্ব ভারতে ঝুম চাষ আর অন্যত্র বন কেটে আবাদ বা বসতি গড়ে তোলার প্রবনতা আছেই। তাছাড়া আছে বন বিভাগের দুর্বলতা—মান্ধাতার আমলের বন্দুক নিয়ে ফরেস্ট গার্ডরা আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত চোরাশিকারিদের মোকাবিলা করবে কীভাবে? এদিকে আন্তর্জাতিক চোরাবাজারে হাতির দাঁত, গণ্ডারের খড়্গ আর বাঘের হাড়ের চাহিদা আকাশ-ছোঁয়া। সংরক্ষিত এলাকাগুলিতেও

দুর্যোগ অব্যাহত। অন্তত চারটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় উদ্যানে (ডাচিগাম, মানস, পালামৌ, নাগার্জুনসাগর) উগ্রপন্থীদের তাণ্ডবে নজরদারি নেই বললেই চলে, মূল্যবান বনসম্পদ লুঠ হচ্ছে অবিরত। চারণসমস্যা তুঙ্গে করবেট, রাজাজি, গির ও রণথম্ভোর জাতীয় উদ্যানে। জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে বিপন্ন অনেকগুলি সংরক্ষিত এলাকা, ঠিক তেমনি খনিজ নিষ্কাশনের চাপে ধুঁকছে হাজারিবাগ, কুদ্রেমুখ, রণথম্ভোর,

লজ্জাবতী বানর

লাল পাণ্ডা

সরিস্কা আর তাড়োবা। বীরাপ্পন যথেচ্ছ লুঠ করছে মুদুমালাই-বান্দীপুর জাতীয় উদ্যান। রাসায়নিক দূষণে বিপন্ন মান্নার উপসাগর। চিলিকা, গহিরমাথা, সুন্দরবন সর্বত্রই 'কমার্শিয়াল ফিশারি'-র আগ্রাসন।

তবে কি আশার আলো নেই? ভবিষ্যতে কি চিড়িয়াখানা বা জাদুঘর ছাড়া হাতি, বাঘ, গণ্ডার দেখা যাবে না? সৌভাগ্যবশত অনেক প্রকৃতিপ্রেমী সংগঠন

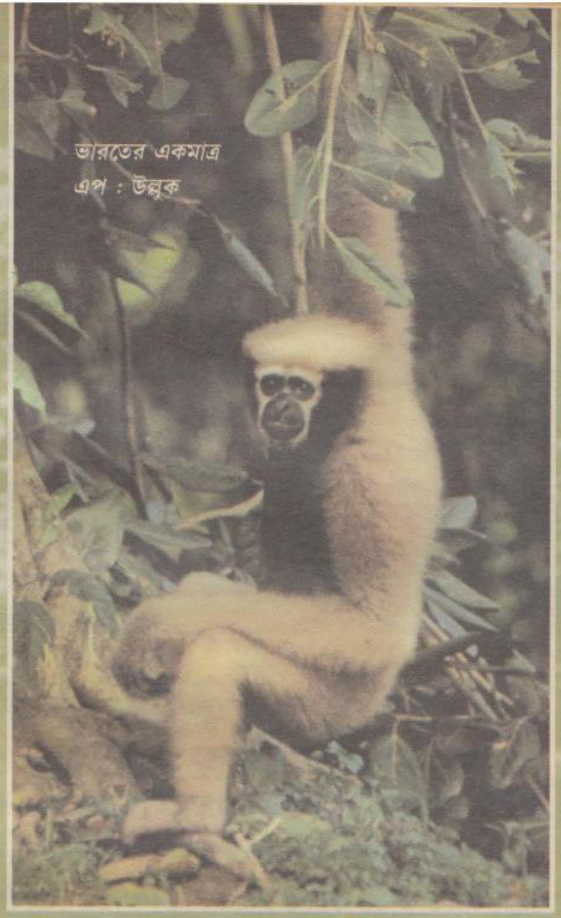
ভারতের একমাত্র এপ : উল্লুক

এগিয়ে এসেছে। সাধারণ মানুষকে নিয়ে বহু মাটি-ছোঁয়া সংগঠন কাজ করছে, বন না বাঁচলে আমরাও বাঁচব না যে। প্রশাসনের একাংশকেও একাজে জোড়া গেছে। ছাত্র আর যুবসমাজে বিশেষ সাড়া পাওয়া গেছে। সুতরাং পরিস্থিতি একেবারে প্রতিকূল নয়। সকলে মিলে যদি একাজে সামিল হই তবে 'নীরব বসন্ত' আসবে না—বনের ছায়া, ফুলের গন্ধ, পাখির গান (আর মাঝেমধ্যে বাঘের গর্জন বা হাতির বৃংহতি) উপভোগ করতে পারব। তা নইলে এ পৃথিবী যে আর বাসযোগ্যই থাকবে না!

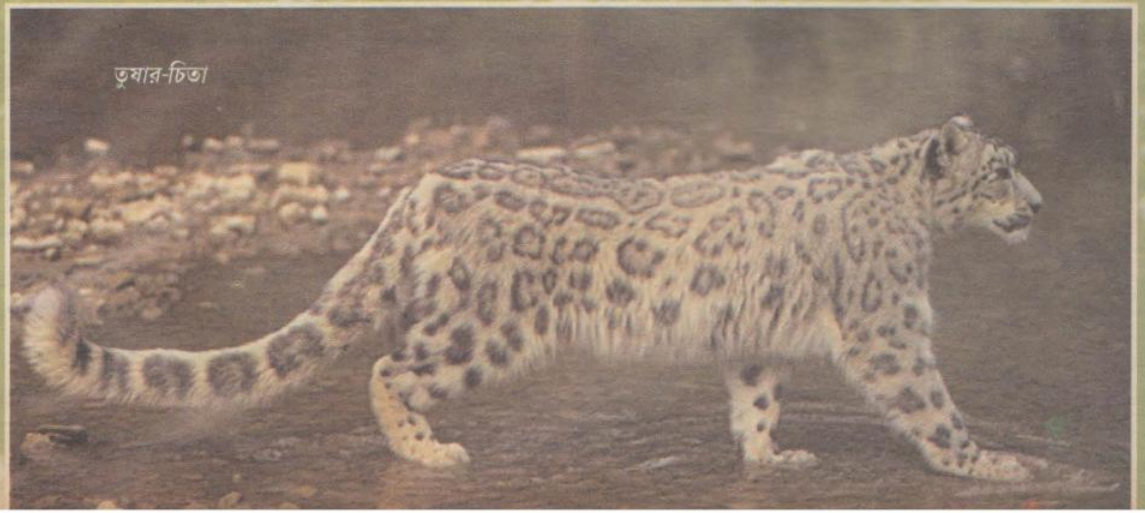
তুষার-চিতা

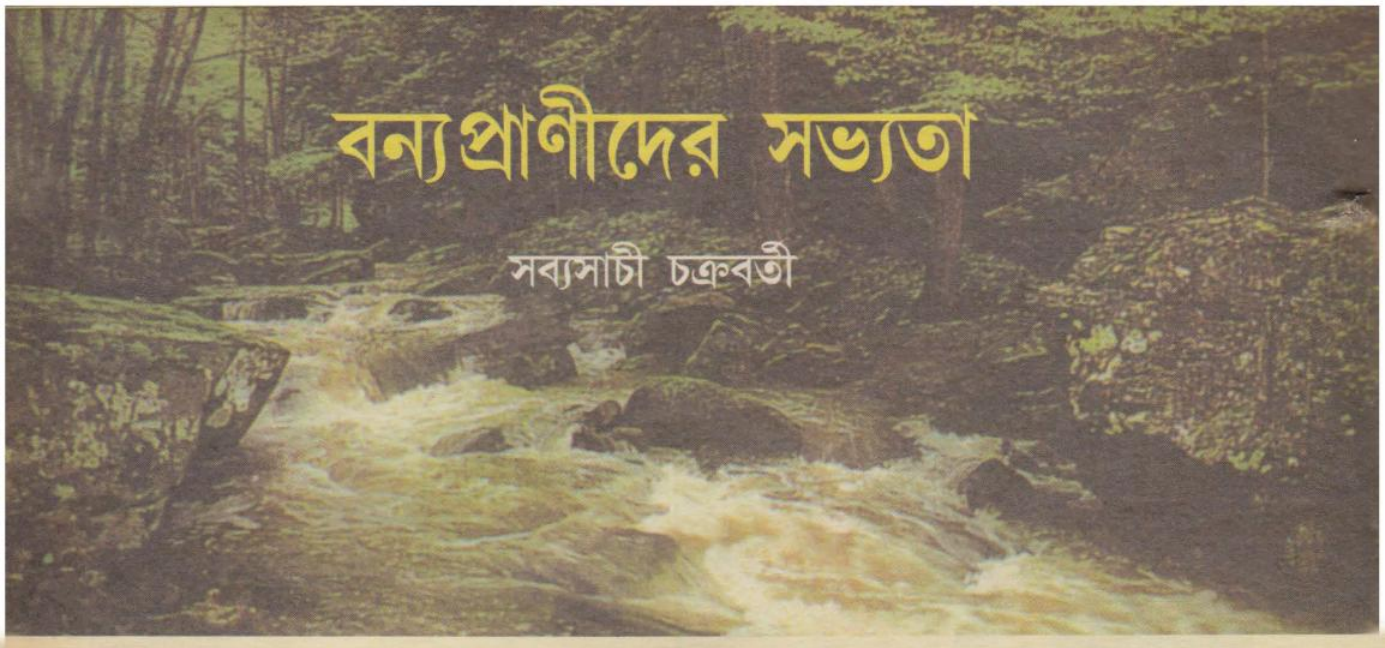

বন্যপ্রাণীদের সভ্যতা

সব্যসাচী চক্রবর্তী

লোকজনকে প্রায়শই বলতে শোনা যায়, 'অসভ্য জানোয়ার কোথাকার'! কিছু লোক অন্যায় অবিচার দেখলেই, 'এ কী জঙ্গলের রাজত্বে বাস করছি'? — এই সব বলেন। কেন বলেন? জন্তুরা জামাকাপড় পরে না বলে? তারা পাকা বাড়িতে থাকে না বলে? তাদের বুদ্ধি মানুষের চেয়ে কম বলে? না কী তারা অন্য জন্তুকে মেরে খায় বলে? আমি বলি? আসলে জন্তুদের যদি মানুষের মতো বুদ্ধি থাকত। তাহলে তারাও সভ্যতার নামে অসভ্যতাকে করতে শিখে নিত। আরও বিশদভাবে বলব? জন্তুরা যদি বাড়ি বানাতে পারত, তাহলেই তাদের আবাসন ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে নানান সমস্যা তৈরি হত। জামা-কাপড় পরা শিখলে সেগুলো কী ফ্যাশনের হবে, কী ধরনের কাপড় হওয়া দরকার। কে বানাবে, কে বিক্রি করবে, এসব নিয়েও লাঠালাঠি শুরু হয়ে যেত। আর তাছাড়া অন্য জন্তু মেরে খাওয়া? সে তো মানুষেও মেরে খায়। তফাৎটা আসলে অন্য জায়গায়, মানুষ ভদ্রতা শিখতে গিয়ে অসভ্য হয়ে যাচ্ছে, আর জন্তুরা অসভ্য হয়েও অনেক বেশি ভদ্র। কোনও জন্তুর খিদে না পেলে অন্যকে মারে না। মানুষ কিন্তু মারে। তাই সেই অসভ্য মানুষকে ভদ্রতার কথা মনে করিয়ে দেবার জন্যে আছে পুলিশ। বনে-জঙ্গলে জন্তুদের কিন্তু কোনও পুলিশের দরকার হয় না।

আমি নানা জঙ্গলে ঘুরেছি, দেখেছি নানারকম জন্তু-জানোয়ার, কীট, পতঙ্গ, পাখি, সরীসৃপ ইত্যাদি। তাদের ভীষণ ভালো লেগেছে। তাদের ছবিও তুলেছি। সেই ছবিগুলিই আমার নিত্যসঙ্গী। যদি সারাক্ষণ তাদের মধ্যে থাকতে পারতাম তাহলে বোধহয় আমি আরও সুখী হতাম। কিন্তু কী করব? আমার তো সে গুণ নেই যে ওদের জন্যে কিছু করি। অত পড়াশুনোও নেই। যা পারি আমি তাই করি। অভিনয় করি আর তাই শহরে থাকি। সুযোগ পেলেই ছুট্ দিই জঙ্গলে, আমার প্রিয় জন্তুদের কাছে, আবার তাদের দেখি, ছবি তুলি আর প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিই। মাঝে-মধ্যে তাদের ছবির প্রদর্শনীও করেছি। অনেকে প্রদর্শনী দেখতে এসেছেন, তাদের ভালো লেগেছে। আমি আনন্দিত হয়েছি। যখন কিছু লোকে ছবির গুণগত মান নিয়ে আলোচনা করেছে, তখনই মুষড়ে পড়েছি; কারণ প্রদর্শনী করার মূল ইচ্ছে তো : 'আমি-কত-ভালো-ছবি-তুলি-দেখুন' নয়। মূল উদ্দেশ্য : 'জন্তু জানোয়ার'রা কত ভালো দেখুন'। আজকাল আর প্রদর্শনী করার তেমন উৎসাহ পাই না। তাই ছবিগুলো নিজের কাছেই রাখি। কেউ চাইলে প্রদর্শনীর জন্যে দিই, না চাইলে দিই না। হঠাৎ মনে হল, 'সন্দেশ' প্রত্রিকার পাঠক-পাঠিকারা কিন্তু সত্যিই বন্যপ্রাণী ভালোবাসে, না হলে 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী নিয়ে এত লেখা ছাপা হত না। তাই ঠিক করলাম কয়েকটি ছবির সঙ্গে আমার যে অভিজ্ঞতা জড়িয়ে আছে তা 'সন্দেশ'-এর পাঠক-পাঠিকাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিই। আশাকরি সকলের ভালো লাগবে।

বান্ধবগড়, মধ্যপ্রদেশ

ক্রেস্টেড সার্পেন্ট ঈগল

Crested Serpent Eagle

এই ছবিটা তোলা জুন মাসের গরমে। বান্ধবগড়ে অনেক পোষা হাতি আছে বন দপ্তরের, যে গুলোতে বনকর্মীরা অরণ্যের ভেতর ঘুরে ঘুরে কাজ করেন। আবার টুরিস্টরা এলে, তাদের তাতে চড়িয়ে 'জয়-রাইড্' দেওয়া হয়, জন্তু দেখানো হয়। ওদের চালায় যে মাহুতরা, তাদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন 'কুট্টাপ্পান' নামের এক ব্যক্তি। কুট্টাপ্পানবাবুর তোলা অনেক ছবি আছে যেগুলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছে। বিদেশেও অনেকে তাঁকে চেনে। সেই কুট্টাপ্পান সাহেবর হাতিতে চড়ে আমি বেরিয়েছিলাম সেবার। অনেক ছবি তুলেছিলাম, সেগুলোর মধ্যে একটা ছবি, হচ্ছে এইটি।

এক প্রকারের ঈগল এটি, 'ক্রেস্টেড্ সার্পেন্ট ঈগল'।

মাথায় একটি 'ক্রেস্ট্' অর্থাৎ ঝুঁটি আছে, যেটা এই ছবিতে ঈগলটি শুইয়ে রেখেছে। আমি ঈগলটাকে দেখেছি প্রায় ৫০ ফিট্ দূর থেকে, ছবি তুলব। এমন সময়ে কুট্টাপ্পান সাহেব বললেন— 'দাঁড়ান, কাছে যাই, আরও ভালো ছবি পাবেন'। সত্যি-সত্যিই কুট্টাপ্পান সাহেবের হাতি ঈগলটির প্রায় দশ ফুটের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল, তাও ঈগলটা বসেই রইল। আশ্চর্য! আমি আর সময় নষ্ট না করে পটাপট গোটা পাঁচেক ছবি তুলে ফেললাম। এটা তারই একটা। তারও দশ-পনেরো সেকেন্ড পর ঈগলটা উড়ে চলে গেল। আমাকে আর তার খুব নিরাপদ মনে হয়নি। আগে উড়ছিল না, কারণ কুট্টাপ্পান সাহেবকে সে চেনে বলে, উনি ওদের বন্ধু। যদি আমিও ওদের বন্ধু হতে পারতাম!

দার্জিলিং চিড়িয়াখানা, পশ্চিমবঙ্গ

তুষার চিতা

Snow Leopard

আমাদের দেশে অনেক রকম বাঘ আছে। বলা যায় বিড়াল প্রজাতির জন্তু আছে, যেমন বাঘ, সিংহ, চিতাবাঘ, কালো চিতা, লেপার্ড ক্যাট, ফিশিং ক্যাট, স্নো লেপার্ড বা তুষার চিতা ইত্যাদি। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিরল প্রজাতির বাঘ হচ্ছে 'তুষার চিতা'। এরা হিমালয়ের অভ্যন্তরীণ এলাকায় থাকে, যেখানে মানুষের পক্ষে হেঁটে যাওয়াও কষ্টকর। এদের দেখা পাওয়াও কঠিন। এরা আস্তে আস্তে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তাই দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় একটি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। এখানে বন্দি তুষার চিতাদের ব্রিডিং করানো হয় এবং চেষ্টা করা হয় যে সেই নতুন প্রজন্মকে যদি আবার অরণ্যে ছেড়ে দেওয়া যায়।

আমরা এক গরমে গিয়েছিলাম গৈরিবাস এবং সন্দাকফু। ফেরার পথে দার্জিলিং চিড়িয়াখানা দেখে এলাম। তুষার চিতাদের খাঁচার কাছে অনেকক্ষণ বসে ছিলাম, দুই পুরুষ চিতার ঝগড়া দেখছিলাম আর ছবি তুলছিলাম। মেঘ করে এসেছিল, বৃষ্টি তখনও শুরু হয়নি, আলো ভীষণ কমে গিয়েছিল, তারই মধ্যে যতটা সম্ভব ভালো ছবি তোলার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। দুটি পুরুষ চিতার মধ্যে একটি মাঝে মাঝে আমার দিকে দেখছিল আবার অন্যটার সঙ্গে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ঝগড়াও করছিল। এক সময় আমার দিকে অনেকক্ষণ দেখার পর 'হালুম' করে একটা ডাকও ছাড়ল, আমি সেই সময় একটার পর একটা ছবি তুলে ফেললাম দুটি ক্যামেরা দিয়ে। একটায় স্লাইড্ ফিল্ম, অন্যটায় প্রিন্ট নেগেটিভ। প্রিন্ট নেগেটিভ থেকে ছাপানো একটি ছবি এখানে দিলাম।

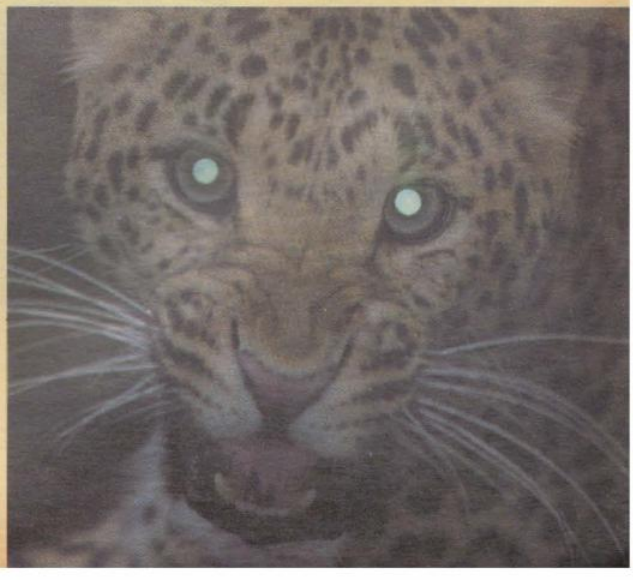

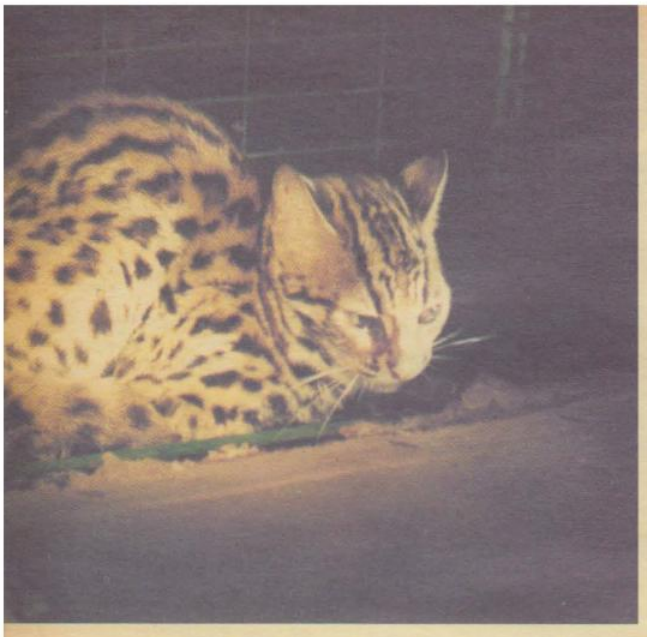

মহানদী অভয়ারণ্য, পশ্চিমবঙ্গ

লেপার্ড ক্যাট

Leopard Cat

শিলিগুড়ি ঢোকার আগেই বাঁদিকে একটি রাস্তা চলে যায় যেটা ধরে সোজা 'সুকনা ফরেস্ট'-এর গা দিয়ে দার্জিলিং চলে যাওয়া যায়। এই 'সুকনা' ফরেস্ট আসলে মহানন্দা অভয়ারণ্যের একটি রেঞ্জ। মহানন্দায় ঢোকার একটা গেট এই সুকনায়। এখানে থাকার জায়গা আছে, নেচার ইন্টারপ্রিটেশান সেন্টার আছে, বনকর্মীদের অফিস আছে, এলিফেন্ট স্কোয়াড্ আছে, রেসকিউ সেন্টার আছে। এই এলিফেন্ট স্কোয়াডের কাজ হচ্ছে হাতি সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থাপনা ও সমস্যার সমাধান। তেমনি রেস্‌কিউ সেন্টারের কাজ হচ্ছে কোনও জন্তু যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে বা আহত হয় এবং জঙ্গলে স্বাবলম্বী হয়ে বাঁচতে পারাটা কঠিন হয়ে পড়ে তাহলে তাকে সেই রেসকিউ সেন্টারে এনে সেবা-সুশ্রূষা করা। সুস্থ হয়ে গেলে আবার ছেড়ে দেওয়া হয়। আমরা যে বার গিয়েছিলাম সে বার ওখানকার রেঞ্জ অফিসার আমাদের সব দেখালেন, বললেন। একটি ঘরে খাঁচায় বন্দি ছিল একটা লেপার্ড ক্যাট। তার ডানচোখটা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, গ্রামের লোকজনের লাঠিপেটা খেয়ে। সে জঙ্গলে খাবার পাচ্ছিল না বলে গ্রামে ঢুকে পড়েছিল খাবারের খোঁজে। ধরা পড়ে যায় এবং মার খেতে হয়। তাকে বনকর্মীরা উদ্ধার করে আনে এবং ডাক্তার তার চিকিৎসা করেন। পাঁচ সপ্তাহ পর সে ছাড়া পায় জঙ্গলে। এই ছবিটা স্পট্‌লাইট্ দিয়ে তুলেছিলাম, তার ছাড়া পাওয়ার এক সপ্তাহ আগে।

এই জন্তুটির মতো আরও কত জন্তু আছে যারা জঙ্গলে খাবার পায় না, মানুষের উপদ্রবে। তাই তো তারা মানুষের বসতির মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং বেঘোরে প্রাণ হারায়। এই ছবিটা সেই সব জন্তুদের উৎসর্গ করে।

বান্ধবগড়, মধ্যপ্রদেশ

বাঘ

Bengal Tiger

সেই কাঠফাটা গরমে বান্ধবগড়ে বেড়ানোর এটা শেষ ছবি। আমরা সকালে ঘুরে আমাদের থাকার জায়গায় যখন ফিরে এলাম, আমাদের গাড়ির চালক জিজ্ঞেস করল, 'বিকেলে কটায় বেরোবেন'? আমি বললাম—

'সাড়ে চারটেয়'। শুনে, সে বলল, 'তখন কিন্তু বেশ গরম থাকবে। সবাই যেতে পারবেন তো?' আমি বললাম, 'চলে আসুন তো, তারপর দেখা যাবে'। যথারীতি সাড়ে চারটেয় দেখলাম সবাই যাবার জন্যে তৈরি। সেদিন এক

অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম। এটা তারই ছবি। এক জলাশয়ের পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে গাইড্ বলল, 'অপেক্ষা করুন। সীতা বোধহয় আসবে'। ঠিক মিনিট পনেরো বাদে সীতা দেবী এলেন। সঙ্গে পুত্র। নাম অবশ্য 'লব' বা 'কুশ' নয়, অন্য কী একটা নাম। বাইশ মাস বয়স। মা ও ছেলে আমাদের দেখল ঠিকই, কিন্তু বেশি চিন্তা না করে সোজা জলে নেমে পড়ল। নামারই কথা, যা গরম! মা ও ছেলে সেই জলে চান করল, জল খেল আর খানিক খেলাও করল। আমি প্রায় দু রোল, অর্থাৎ ৭০ টা ছবি তুললাম। আগের পাতায় তারই একটা।

দু'জনেই আধ-ডোবা অবস্থায় আমাদের দেখছে। হঠাৎ আমার গায়ে জল পড়ল! আমি ভাবলাম বৃষ্টি নাকি? ওপরে তাকিয়ে দেখি একটি হনুমান, আমাকে টার্গেট করে মূত্রত্যাগ করছেন! আমার কিছুই করার নেই, খালি বৃষ্টির ঠান্ডা জলের পরিবর্তে হনুমান বাবাজির গরম জল পেলাম। তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। এই তো জঙ্গল। আমরাই তো ওদের বাড়িতে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেছি। আপত্তি ওরা তো জানাবেই। যে 'সীতা'র ছবি এখানে দিলাম, সে 'সীতা' আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু গাছের নীচে বসা 'সীতা' এখনও আমাদের স্মৃতিতে আছে। থাকবে।

কান্‌হা, মধ্য প্রদেশ

গৌর

Gaur

জানুয়ারি মাসের শীতে বেড়াতে গিয়ে ডেপুটি ফিল্ড ডিরক্টের মিস্টার নেগীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তাঁর থেকে অনুমতি নিয়ে আমরা কান্‌হা'র একটা দুর্গম অঞ্চলে গিয়েছিলাম। 'বামনি দাদর'। এখানে বহু যুগ আগে একটা উড়োজাহাজ নামার জন্যে রানওয়ে তৈরি হয়েছিল, এখন শুধু ঘাসজমি। দেখে খানিকটা আফ্রিকার বিস্তীর্ণ জমির সঙ্গে মিল পেলাম। একদল 'গৌর' অর্থাৎ ভারতীয় বাইসন-এর দেখা পেলাম। এরা এক সারিতে জঙ্গল পার হয়। সবচেয়ে সামনে থাকে যেটা সবচেয়ে বড়ো পুরুষ এবং একদম শেষে থাকে দ্বিতীয় সবচেয়ে বড়ো পুরুষ। মাঝখানে মহিলারা। বাচ্চারা আর যুবক-যুবতিরা। আমরা গাড়ি দাঁড় করিয়ে তাদের দেখছিলাম, হঠাৎ তারা রাস্তা পার হতে আরম্ভ করল। আমি ক্যামেরা তাক করে ছবি নিতে শুরু করলাম। সবচেয়ে বড়ো পুরুষ বাইসনটা রাস্তার ওপর আসতেই আমার ক্যামেরা খটাস্ করে আওয়াজ করল। প্রায় ৭০-৮০ ফুট দূর থেকে সেই বাইসনটা আওয়াজ শুনে দাঁড়িয়ে গেল এবং আমাদের দেখতে থাকল। আমি চিন্তিত! ওই আটশো কিলোর বাইসনটা যদি আমাদের দিকে এগিয়ে আসে? কিন্তু সে এল না, খানিক দেখে আবার রাস্তা পার হয়ে গেল, পেছন পেছন পুরো দলটা। কী চেহারা! কী ধীর-স্থির! সে জানে তার শক্তি কতটা, তাই সে আমাদের পাত্তা দেয় না। আমরা, যারা কমজোরি, যারা দুর্বল, আমরাই বেশি লম্ফ-ঝম্ফ করি। কামড়াকামড়ি করি। জোর ফলাই। বেঁচে থাক ভারতীয় বাইসন আমাদের জঙ্গলে চিরকাল, এই কামনা করি।

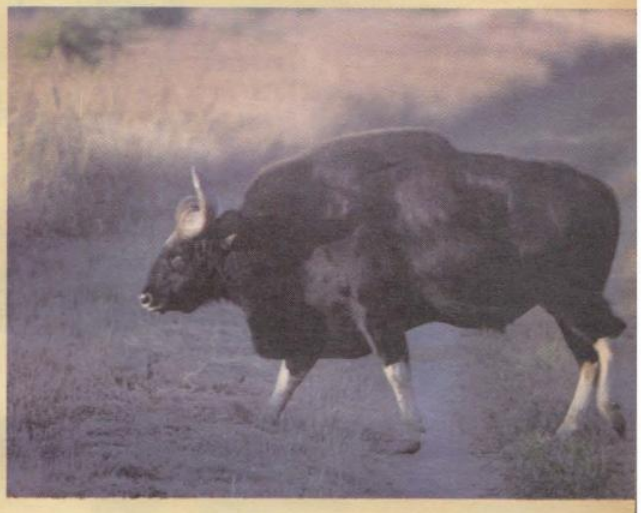

এই ছবিগুলোর সঙ্গে এতগুলো কথা লেখার একটাই উদ্দেশ্য আমার, সেটা হচ্ছে 'সচেতনতা' বাড়ানো। আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই প্রকৃতি কত শক্তিশালী, তাই সে আমাদের আগলে রাখে। এই পৃথিবী শুধু মানুষের বাসস্থান নয়, এ পৃথিবী সব প্রাণীর। এখানে সবার বাঁচার সমান অধিকার আছে। আজ বুদ্ধির জোরে মানুষ সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী, তাই তার উচিৎ অন্যদের সংরক্ষণ করা। তবেই তো মানুষ বড়ো হবে, তবেই তো মনুষ্যত্বের আসল পরিচয়। এই প্রকৃতি কিন্তু আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছে। সফল যদি হতে হয়, পড়তে হবে, জানতে হবে, কাজ করতে হবে, ভাবতে হবে। আর পরীক্ষায় যদি সফল না হই, যদি ফাঁকি মারি, প্রকৃতি আমাদের শাস্তি দেবেই তার নিজস্ব ঢং-এ, নিজস্ব মহিমায়। বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ঝড়, আরও কত শাস্তির উপায় আছে প্রকৃতির কাছে।

অনেকে বুঝেছে আর সেইমতো কাজ করছে। যারা এখনও বোঝেনি তাদের বুঝতে হবে। যেদিন বেশিরভাগ মানুষ 'আমি' ছেড়ে 'আমরা'-তে পৌঁছতে পারবে, সেইদিন মানুষ সবদিক থেকে সভ্য হবে। ততদিন জঙ্গলের সভ্যতাই আমার শিক্ষক।

ফোটো : লেখক

পূর্ব প্রকাশিতর পর

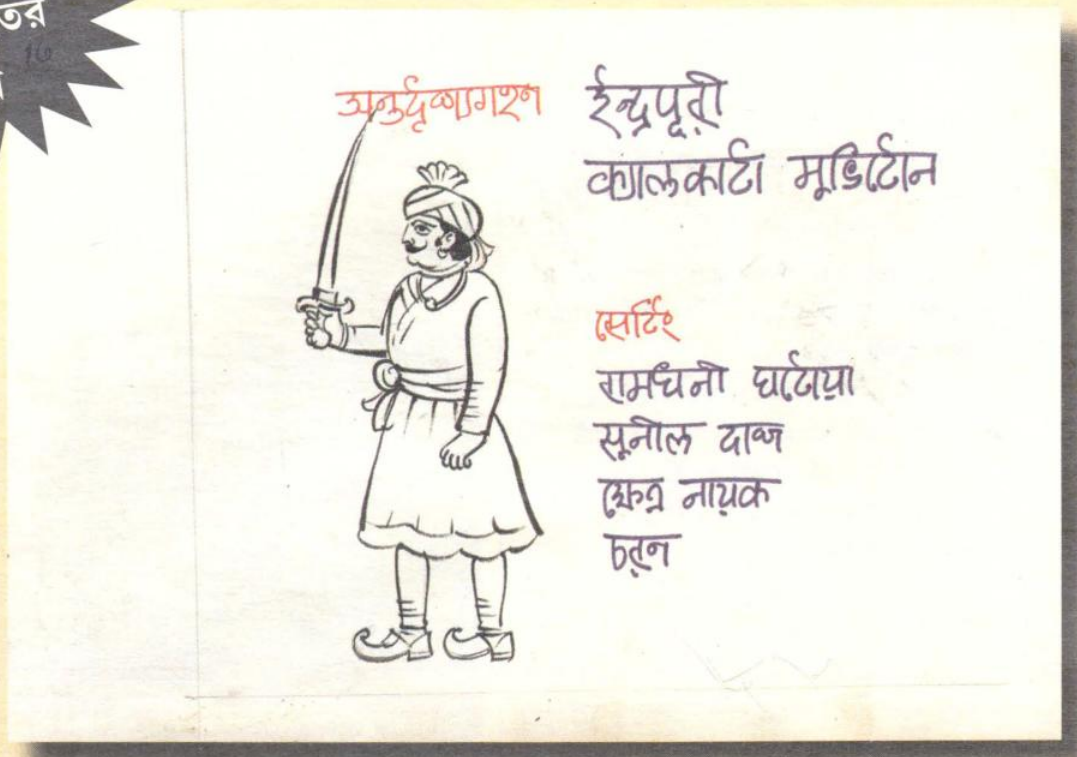

জয় বাবা ফেলুনাথ

চিত্রনাট্য : প্রথম খসড়া

GHOSAL'S COURTYARD / DAY

সিংহ থেকে ক্যামেরা পিছিয়ে এসে দেখান হয় দুর্গার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হচ্ছে। বাড়ির এবং পাড়ার লোকজন রয়েছে। উমানাথকেও দেখা যায়।

ফেলু, তোপ্‌সে, লালমোহন আসে। ফেলু ব্যস্তভাবে উমানাথের দিকে এগিয়ে যায়।

ফেলু রুকু কোথায়? রুকুকে দেখছি না—

উমা সেতো অভিমান করে তার ছাতের ঘরে বসে আছে—

ফেলু কেন, কী হল?

উমা প্রাণপ্রতিষ্ঠা হচ্ছে, তার মধ্যে ঠাকুরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে— naturally ধমক দিয়েছি—

ফেলু, তোপ্‌সে, লালমোহন রুকুর উদ্দেশ্যে চলে যায়।

GHOSAL'S RESIDENCE / ROOF

রুকুর ঘরের দরজা বন্ধ। ফেলু দুবার ধাক্কা দিয়েও কোনো ফল হয়না।

ফেলু ক্যাপ্টেন স্পার্ক! ক্যাপ্টেন স্পার্ক!

রুকুকে দেখা যায় দরজার দিকে পিঠ করে মাটিতে বসে আছে।

ফেলু ক্যাপ্টেন স্পার্ক! আমি রিভলভার এনেছি— তুমি দেখবে না?

এবার ফল হয়। রুকু দরজা খোলে।

রুকু কোথায় রিভলভার?

ফেলু রিভলভার বার করে দেখায় — কী ভাবে কী হয় সব বুঝিয়ে দেয়।

ফেলু আ- র সেই মাথার অস্ত্রটা কিন্তু ক্যাপ্টেন স্পার্কের অনেক কথা জেনে নিয়েছে।

রুকু কী কথা?

ফেলু অ্যাফ্রিকার রাজা হচ্ছে দুর্গার বাহন, আর গণেশটা তুমি চুইং গাম দিয়ে সিংহের মুখের ভিতর আটকে দিয়েছিলে— তাই না?

রুকু না হলে যে গণ্ডারিয়া নিয়ে নিত। ওযে বাবাকে বলেছিল গণেশটা নিয়ে নেবে।

ফেলু তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে শুনছিলে?

রুকু হ্যাঁ—

ফেলু তারপর?

রুকু তারপর আমি চুপি চুপি র‍্যাক্সিটের কাছে গেলাম।—

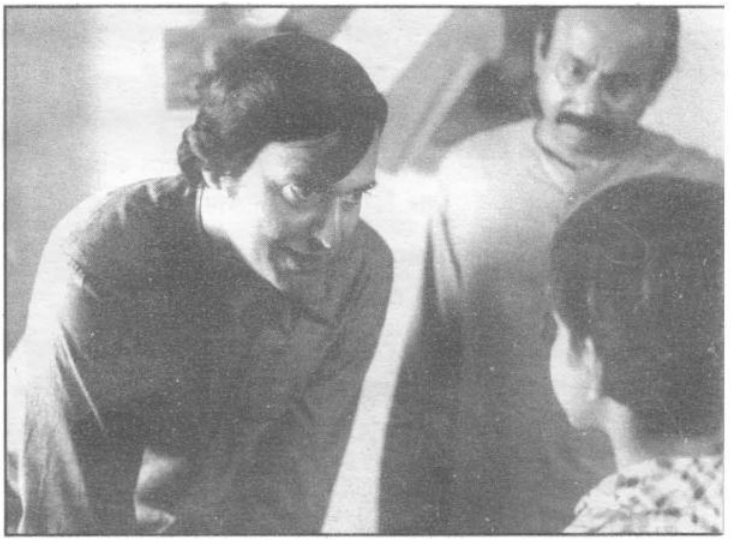

FLASHBACK

রুকু চোখে একটা কালো mask পরেছে। সে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে অম্বিকা ঘোষালের দরজায় উঁকি মারে।

রুকু র‍্যাক্সিট!

ঘোষাল আরামকেদারায় বসে বই পড়ছিলেন, তিনি ঘাড় ঘোরান।

রুকু নিচে একজন দুষ্টু লোক এসেছে, সে তোমার গণেশটা কিনে নেবে বলছে!

অম্বিকা কে লোক?

রুকু ডাকু গণ্ডারিয়া। বাবার সঙ্গে কথা বলছে। অনেক টাকা দেবে বলছে!

অম্বিকা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন।

অম্বিকা চলো ত দেখা যাক্ কী ব্যাপার!

দুজনে ঘরের দরজার দিকে এগোয়।
এর পর দেখা যায় দুজনে নিচের বসবার ঘরের দরজার বাইরে আড়ি পাতছে।
তারপর তারা সরে যায় দরজার মুখ থেকে।

রুকু (NARRATION) আমরা দুজনে গণ্ডারিয়ার কথা শুনে আবার উপরে চলে এলাম।

এবার দাদু-নাতিকে দেখি অম্বিকা ঘোষালের ঘরে।

অম্বিকা ব্যাপারটা ত ভালো লাগছেনা, ক্যাপ্টেন স্পার্ক!

রুকু চলো আমরা গণেশটাকে লুকিয়ে রাখি।

অম্বিকা কোথায় বলত?

রুকু তুমি যে সেদিন একটা গল্প বললে - একটা দুষ্টু লোক তার পোষা কুমীরের মুখের ভিতর একটা হীরে লুকিয়ে রেখেছিল? — তেমনি এটাকে আমরা সিংহের মুখে লুকিয়ে রাখব।

অম্বিকা সিংহ?

রুকু দুর্গা ঠাকুরের সিংহ—

অম্বিকা আর কেউ যদি জিগ্যেস করেত বলবে সেটা অ্যাফ্রিকার রাজার কাছে আছে।

রুকু আচ্ছা!

অম্বিকা আর আমরা ভাসানের ঠিক আগের দিন ওটাকে বার করে নেব- নাহলে আবার গণেশটা জলের তলা দিয়ে সেই অ্যাটলান্টিসে পৌঁছে যাবে!

FLASHBACK ENDS

RUKU'S ROOM

ইতিমধ্যে অম্বিকা ঘোষাল এসে হাজির হয়েছেন। রুকুর কথা শেষ হয়ে যাবার পর তিনিই মুখ খোলেন।

অম্বিকা শুনলেন ত বুড়োর কীর্তি?

ফেলু তা ত শুনলাম, কিন্তু আপনার কীর্তির পিছনে যে আবার আরেকজনের কীর্তি রয়েছে। আপনার সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিই— ইনিই হচ্ছেন 'করাল কুম্ভীর' লেখক জটায়ু।

লালমোহন একটা কৃত্রিম কুণ্ঠার ভাব প্রকাশ করে।

অম্বিকা আপনিই জটায়ু?!

জটায়ু হেঁ হেঁ— আমি কিছুই না—

অম্বিকা তাহলে ত বলতে হয় আপনার জন্যই আমার গণেশ বেঁচে গেল।

রুকু তারস্বরে প্রতিবাদ করে ওঠে সকলকে চমকে দিয়ে—

রুকু গণেশ ত নেই!

ফেলু
অম্বিকা } গণেশ নেই?

রুকু সিংহের মুখে ত কিচ্ছু নেই— খালি চুইং গাম লেগে আছে। আমি দেখছিলাম বলেই ত বাবা আমাকে মারলেন।

সকলে কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ। তারপর —

ফেলু (গম্ভীর) মিস্টার ঘোষাল— আপনি আমাকে ডেকেছিলেন চুরি ধরতে নয় — চোর ধরতে। তাইত?

অম্বিকা তাত বটেই! আমার সিন্দুকে কার হাত পড়েছে সেটা জানতে হবে না? যার মনে চুরি, সেই ত চোর!

ফেলু কিন্তু এখন ত ব্যাপারটা একটু অন্যরকম চেহারা নিচ্ছে—

অম্বিকা এখন ত চুরি!

ফেলু হঠাৎ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে— লালমোহন, তোপ্‌সে তার পিছনে।

অম্বিকা কোথায় চল্লেন?

ফেলু একবার বিকাশবাবুর সঙ্গে দেখা করা দরকার।

অম্বিকা কিন্তু সে কি আছে?—

ফেলুরা নিচে রওনা দিয়ে দিয়েছে।

BIKASH'S ROOM

বিকাশ নেই ঘরে। ফেলুরা আসে।

লাল Out।

অম্বিকাও এসে পড়েছে।

অম্বিকা তাকে ত মিষ্টি কিনতে পাঠাল উমা। কাল সব আত্মীয়স্বজনরা এসে পৌঁছছে। কচুরি গলিতে গেছে বোধহয়।

ফেলুর দৃষ্টি ঘরের চারিদিকে ঘুরছে। একপাশে মাটিতে রাখা সুটকেসের দিকে তার চোখ গেছে এখন। তার গায়ে লেখা B.S.।

ফেলু S- টা কী?

অম্বিকা আজ্ঞে?

ফেলু বিকাশবাবুর পদবীটা?

অম্বিকা সিংহ।

ফেলুর মুখের চেহারা বদলে যায়। তার চিন্তা এখন নতুন রাস্তায় চলেছে।

ফেলু কচৌরি গলি বললেন ত—

অম্বিকা মিষ্টিত ওখান থেকেই আনানো হয়—

ফেলু ঠিক আছে — আমি বেরোচ্ছি। লালমোহনবাবু — আপনারা হোটেলে গিয়ে breakfast সেরে নিন— আমি কখন ফিরব জানিনা।

ফেলু সকলকে হতভম্ব করে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

POLICE HEADQUARTERS

ইনস্পেক্টর তেওয়ারির টেলিফোন বেজে ওঠে।

তেওয়ারি হ্যালো— বলুন মিস্টার মিত্তির... কোথায়? ... মানমন্দির? ... ঠিক আছে... হ্যাঁ হ্যাঁ ... definitely–

KACHAURI GALI

বিকাশ একটা পানের দোকান থেকে সিগারেট কেনে। সে দিব্যি নিশ্চিন্ত।

TAXI / INTERIOR / DAY

ফেলু চলেছে শহরের দিকে, তার মুখ গম্ভীর, থমথমে।

KACHAURI GALI / SWEET SHOP

বিকাশ আসে। হালুইকর হাসিমুখে বিকাশকে অভ্যর্থনা জানায়। এটা বিকাশের খুবই চেনা দোকান।

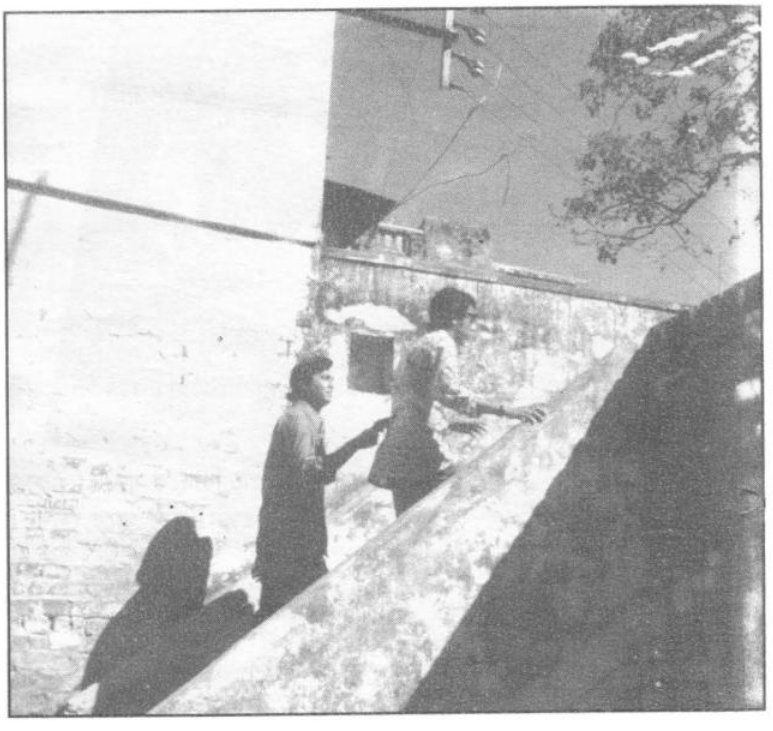

হালুই আসেন বাবু, কী চাই বলুন।

বিকাশ রাবড়ি লাগবে, আর পেঁড়া—

KACHAURI GALI / ANOTHER PART

ফেলু দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে- এদিক ওদিক দেখতে দেখতে। একটা মোড় ঘুরতেই সে বিকাশকে দেখতে পায়। ফেলু বিকাশের দিকে এগিয়ে যায় বেশ স্বাভাবিক ভাবে। কথাও বলে স্বাভাবিক ভাবেই।

ফেলু এইযে— আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম।

বিকাশ কেন বলুন ত।

ফেলু একটু কথা ছিল—

বিকাশ ও। কী ব্যাপার?

ফেলু এখানে ত হবেনা— একটু নিরিবিলি চাই।

বিকাশ (nervous) ও—

ফেলু আপনি চলুন আমার সঙ্গে— মিষ্টিটা পরে নিয়ে যাবেন।

বিকাশ একটু যেন ইতস্তত করে।

ফেলু চলুন, ব্যাপারটা জরুরী।

ফেলু-বিকাশ রওনা দেয়। দুজনে পাশাপাশি হাঁটছে।

ফেলু (whisper) পালাবার চেষ্টা করবেন না, কারণ আমার সঙ্গে অস্ত্র আছে। ডাইনে বাঁয়ে যেদিকে বলব চলুন।

MANMANDIR / DAY

ফেলু-বিকাশ মানমন্দিরের সিঁড়ির দিকে এগোয়। সিঁড়ির মুখে এসে বিকাশ আবার ইতস্তত করে। ফেলু হুকুম দেয়।

ফেলু উঠুন— ওপরে চলুন।

দোতলায় উঠে একটা নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে ফেলু থামে।

ফেলু বসুন—

বিকাশ একটা পাথরের Seat-এ **বসে।**

ফেলু যার একটা কথাও মিথ্যে বলে ধরা পড়ে তাকে আর বিশ্বাস করা যায় না। সেদিন আপনি আখতারির গান না শুনে কী করছিলেন বলুন।

বিকাশ সেদিন—?

ফেলু যেদিন মগনলাল এসেছিল।

বিকাশ আমি ত—

ফেলু আরো মিথ্যে বললে আরো জালে জড়িয়ে পড়বেন কিন্তু। সেদিন সন্ধ্যা ৭টার সময় ভারতবর্ষের কোনো স্টেশন থেকে গান হচ্ছিল না। কী করছিলেন আপনি?

ফেলু পকেট থেকে revolver **বার করে।**

ফেলু আমি বলব? অপনি আড়ি পেতে মগনলালের কথা শুনছিলেন— তাই না?

বিকাশ মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে।

ফেলু তারপরের ঘটনা বলুন।

বিকাশ মগনলাল সেটা দেখে ফেলে। আমাকে ডেকে পাঠায় - পরদিন। পাঁচশো offer করে আগাম— আর পরে আরো পাঁচশো - আর কলকাতায় চাকরি— যদি গণেশটা এনে দিতে পারি। - আমার এখানে কোনো future নেই, মিস্টার মিত্তির—

ফেলু Future-এর কথা ছাড়ুন, এখন past নিয়ে কথা হচ্ছে। আপনি গণেশ এনে দিতে রাজি হন।

বিকাশ হ্যাঁ—

ফেলু তারপর?

বিকাশ গণেশ ছিলনা। আমি সেই রাত্রেই সিন্দুক খুলি। গণেশ ছিল না।

ফেলু আপনি সেটা মগনলালকে জানিয়ে দেন।

বিকাশ হ্যাঁ—

ফেলু তারপর?

বিকাশ তারপর কাল সন্ধেবেলা— আমি তখন ঘরেই ছিলাম হঠাৎ...

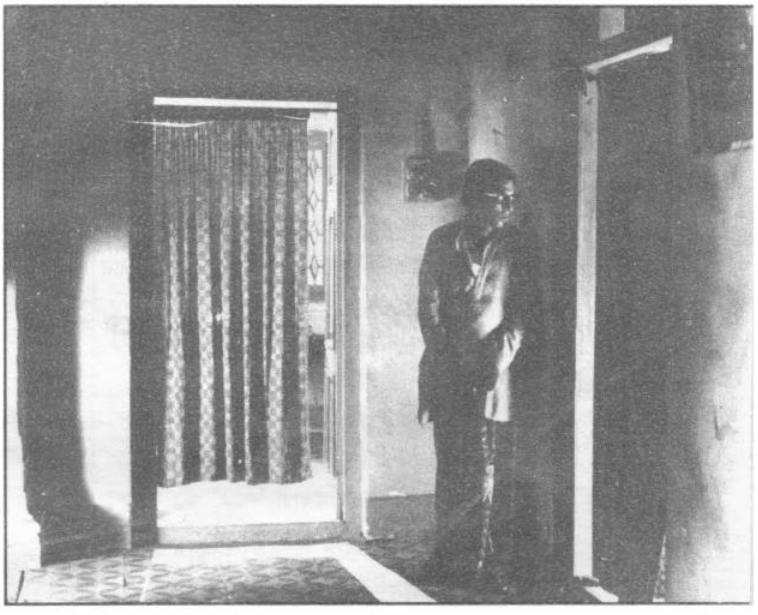

FLASHBACK

BIKASH'S ROOM / NIGHT

শশীবাবু কাঁপতে কাঁপতে ঘরের দরজায় এসে উপস্থিত হন।

শশী আমার— আমার কোনো অপরাধ নেই সিংহি মশাই! আমি ধর্মসাক্ষী করে বলছি! এই এইটে—

শশী গণেশটা দেখায়।

শশী এইটে ছিল ঠাকুরের সামনে মাটিতে পড়ে— কে রেখেছে জানিনা— আপনি বিশ্বাস করুন। আমি এই আপনার হাতে তুলে দিলাম। দোহাই আপনার— আপনি আর কাউকে বলবেন না। আপনি যা বলতে চান বলবেন— আমি পেয়েছি বলবেন না!

বিকাশ (narration) আমি গণেশটা নিয়ে তক্ষুণি মগনলালের কাছে যাই।

MAGANLAL'S ROOM

মগনলাল তার কথামত আরো পাঁচশো টাকা বিকাশকে দেয়।

মগন আপনার কলকাতার টিকিট কিনা হয়ে গেছে?

বিকাশ হ্যাঁ—

মগন তিনদিন পরে আপনি কলকাতায় আমার সঙ্গে এসে দেখা করবেন— বিকাল চারটার সময়। লেকিন

একটা কথা— কালকের দিনটা আপনি খুব সাবধানে থাকবেন! একদম normal। বাড়ির কামউম যা বলে সব করবেন। মিস্টার মিত্তির আর যায়নি ঘোষাল বাড়ি সে খবর আমি জানি— লেকিন ও লোকটাকে বিসোয়াস নেই—

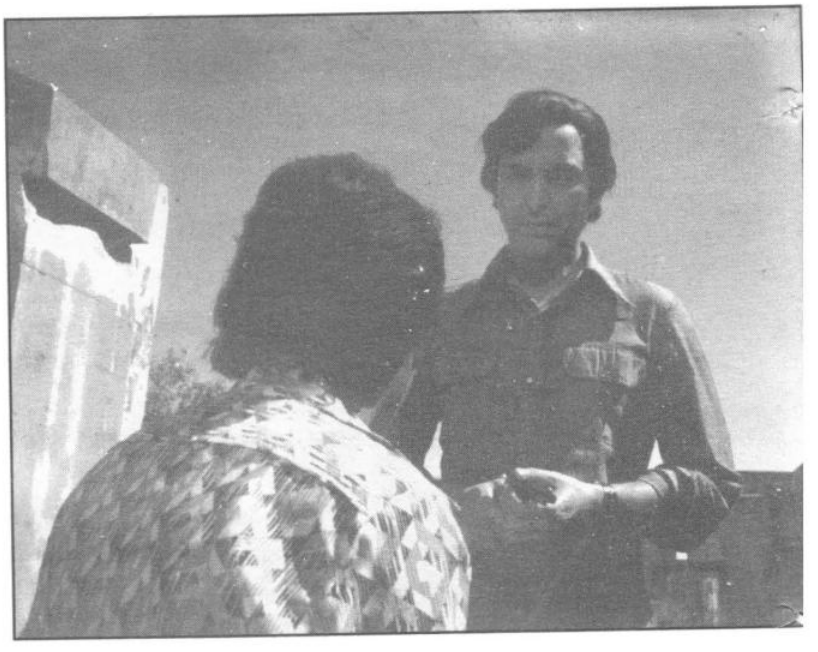

বিকাশ উঠতে যাবে, মগনলাল বাধা দেয়।

মগন বসুন!— আগে কাম শেষ হোক তারপর তো যাবেন!

বিকাশ আর কী কাজ?

মগন খুব জরুরী কাজ ত বাকি আছে বিকাশবাবু! শশীবাবু গণেশের কথা কাউকে বলবেনা তার কী guarantee আছে?

বিকাশ লোকটা খুব ভালো, মানে সৎ লোক—

মগন ভালো লোক, খারাপ লোক, চালাক লোক, বুদ্ধু লোক— এসবের কী মানে আছে বিকাশবাবু? আপনি কাকে ছাড়বেন, কাকে বিসোয়াস করবেন?

বিকাশ চুপ করে থাকে, তার চাহনিতে ভীতি প্রকাশ পাচ্ছে।

মগন ভয় নেই বিকাশবাবু, এ কাজটা আমি আপনাকে করতে বলব না । আপনি পারবেন না। আমি আপনাকে লোক দিয়ে দিচ্ছি— আপনি শুধু চিনিয়ে দিবেন শশীবাবুকে!

মগনলালের কলিং বেল ঠং করে বেজে ওঠে।

FLASHBACK ENDS

MANMANDIR

বিকাশ এখন মরিয়া।

বিকাশ আমি খুন করিনি মিস্টার মিত্তির! বিশ্বাস করুন— আমি খুন করিনি!

ফেলু সেটা জানি। চলুন— উঠে পড়ুন।

ইতিমধ্যে তেওয়ারির দল এসে হাজির - তারা কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। ফেলু বিকাশকে তাদের দিকে চালিয়ে দিয়ে তেওয়ারিকে উদ্দেশ্য করে বলে—

ফেলু ইনি চুনোপুঁটি— বুঝতেই পারছেন। রাঘব বোয়ালের জন্য অন্য ব্যবস্থা।

আগামী সংখ্যায় শেষ

চিত্রনাট্যে পাণ্ডুলিপির বানান অপরিবর্তিত রাখা হল।

ফোটো : সন্দীপ রায়

হ্রস্ব বিষয়ে দীর্ঘ বিবাদ

পাঁচ কথার পাঁচ

শুভেন্দু দাশমুন্সী

বেশ রাগ-রাগ মুখে ঘরে ঢুকল কালাচাঁদ। আজ সে কলেজস্ট্রিট থেকে অনেকগুলো বই কিনে এনেছে। সব ক'টা বই-ই বিভিন্ন স্কুলের ক্লাস সিক্স বা সেভেনের বাংলা বই হিসেবে পড়ানো হবে। ঘরে ঢুকেই বইগুলো টেবিলের ওপর ছুড়ে ফেলে বলল, 'কী সব যে চলছে চারদিকে! ছি ছি!'

টেবিল থেকে বইগুলো হাতে তুলে বুলবুল উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে বলল, 'বাপ রে এইসব নমুনা ক্লাস সিক্স-সেভেনের বইয়ের?'

বাঁ হাতে চায়ের কাপ নিয়ে, ডান হাত দিয়ে দুটো বই তুলে দেখছিল রিমঝিম। হঠাৎ কী জানি কী দেখে একটা দুর্দান্ত বিষম খেলো সে। এদের ভাবগতিক দেখে লাবণ্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কী। নতুন বইগুলো দেখে তোমাদের এই অবস্থা কেন?'

'আর কেন?' লাবণ্যর হাতে কটা বই তুলে দিয়ে কালাচাঁদ বলল, 'দেখুনই না বইয়ের বানানগুলো।'

'আচ্ছা দিদি, শ্রেণী বানানে আমরা কী লিখি? মূর্ধন্যয় হ্রস্ব-ই না দীর্ঘ-ঈ?' রিমঝিমের প্রশ্ন।

'অবশ্যই দীর্ঘ-ঈ।' পরিষ্কার উত্তর দিলেন রিমঝিমের প্রাক্তন শিক্ষিকা। 'ছি ছি এসব কী ব্যাপার! প্রথম পাতাতেই লেখা ''ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য'' ''সপ্তম শ্রেণির জন্য''। এইসব বই বোর্ডের ছাড়পত্র পেল কী করে?' রীতিমতো ঝাঁজিয়ে উঠলেন লাবণ্য।

'শুধু শ্রেণীই নয় দিদি,' রিমঝিম বলল, 'গোটা বইতে এইরকম একগাদা ভুল বানান আছে। এই দেখুন, এখানে 'রচনাবলী'-র বানান লিখেছে 'রচনাবলি', এখানে 'ধরণী' 'তরণী'কে লিখেছে 'ধরণি', 'তরণি'। আবার এই যে এখানে দেখুন, এই বইতে আবার কাজী নজরুল ইসলাম হয়ে গেছেন কাজি নজরুল ইসলাম। এই যে কাজী-র দীর্ঘ-ঈ, হয়ে গেছে হ্রস্ব-ঈ।'

'না হয় মানছি নতুন বানানে বাড়ী-গাড়ী-শাড়ী-মালী-বুড়ী এইসব বানানে হ্রস্বই হয়েছে। এখন লিখব, বাড়ি-গাড়ি-শাড়ি-মালি-বুড়ি। কিন্তু তাই বলে সব জায়গায় এইরকম দুমদাম হ্রস্ব-ই বসানোটা মানা যায় না।' বুলবুল বলল।

'তুমি এরকম রক্ষণশীল, জানা ছিল না তো।' ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মনে হল ভোলানাথবাবু বুলবুলের কথা শুনেছেন। 'এত ব্যাপারে তোমার মন কত খোলা। অথচ বানানোর ব্যাপারে তোমার এতখানি আঁটিসুঁটি কেন?'

'আপনি দেখুন আগে, কী কাণ্ড চলছে চারদিকে! তারপর না হয় আমাকে বকবেন।' বুলবুল বইগুলো ভোলানাথবাবুর হাতে তুলে দিল।

'নাহ্। বানানে তো কিছু গণ্ডগোল দেখছি না।' সবাইকে থতমত খাইয়ে দিয়ে ভোলানাথবাবু বললেন।

'বলেন কী? এই যে শ্রেণী-ধরণী-রচনাবলী-অন্তরীক্ষ সূচীপত্র, চীৎকার, রজনী, পদবী বানানগুলোতে পাইকারি হারে সব দীর্ঘ-ই-র জায়গায় হ্রস্বই দেখছেন, এতে গোলমাল নেই বলছেন!' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কালাচাঁদ।

'গোলমাল তো কিছু নেই। আসলে তোমরা ভুলে যাচ্ছ, এটা একটা নতুন সিলেবাসের বই।'

'হ্যা, হোক না গে নতুন সিলেবাস, তার সঙ্গে বানানের কী সম্পর্ক?' লাবণ্যর প্রশ্ন, 'নতুন সিলেবাস বলে ভুল বানান লিখতে হবে'?

'না, না—নতুন সিলেবাসে ভুল বানান লিখবেন কেন? নতুন সিলেবাসে নতুন বানান লিখবেন।' বোঝাতে চেষ্টা করেন ভোলানাথবাবু।

'নতুন লিখতে তো আপত্তি নেই,' বুলবুল বলে, 'তখন তো আমি সেই কথাই বলছিলাম। বাড়ি-গাড়ি-শাড়ি-মালি-বুড়ি লিখতে তো আপত্তি নেই। পুরোনো 'খুশী' কে 'খুশি' লিখতেও কোনও আপত্তি নেই। আমরা তো নতুন বানানে আপত্তি করছি না।'

'ও এটাই বুঝি তোমাদের কাছে নতুন।' অদ্ভুত সুরে একটু মজা করে বললেন ভোলানাথবাবু। 'তাহলে তো মুনশিজির বয়স এখন বছর চার-পাঁচ আর আমি জন্মাব-জন্মাব করছি, লাবণ্য এখনও জন্মায়নি আর তোমাদের কথা তো দূরস্থান, তোমাদের বাবা মায়েরা জন্মেছেন কী না হিসেব কষে দেখতে হবে।'

'তার মানে?' হতভম্ব কালাচাঁদ।

'মানে আর কিছুই না, তোমরা যাকে বলছ নতুন বানান, সেই নতুন বানান বাংলায় আজ প্রায় পঁচাত্তর বছর হল চালু হয়ে গেছে। আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই ১৯৩০ সাল থেকেই নিয়ম হয়ে গেছে বাংলায় সংস্কৃত থেকে যেসব শব্দ সরাসরি বা বলা ভালো হুবহু এসেছে সেগুলো ছাড়া অন্য সমস্ত শব্দে হ্রস্ব-ই লিখতে হবে।'

বললেন ভোলানাথবাবু, 'সেই হিসেবেই বাড়ি-গাড়ি-খুশি-শাড়ি সব হ্রস্ব-ই হয়ে গেছে প্রায় সত্তর বছর আগে—১৯৩৬ সাল থেকে। তবে সেখানে বলা হয়েছিল কুম্ভীর থেকে এসেছে বলে কুমীর বানানে দীর্ঘ-ঈ রাখতে পার আবার হ্রস্ব-ই দিয়েও কুমির লিখতে পার। ঠিক সেইভাবে পক্ষী থেকে এসেছে বলে পাখি বানানে দীর্ঘ-ঈ ও লিখতে পার। হ্রস্ব-ই-ও লিখতে পার। কিন্তু সে বেশ গোলমেলে ব্যাপার ছিল। বলা হয়েছিল পক্ষী থেকে আসা পাখিতে হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ই দুই-ই চলবে বা ঊনবিংশ থেকে তৈরি করা উনিশ-এর বানানে উনিশ-ঊনিশ দুই-উ চলবে। কিন্তু হীরক থেকে তৈরি করা হীরা বা হীরে শব্দে হ্রস্ব-ই বসানো চলবে না।'

'সে আবার কী রকম নিয়ম?' কালাচাঁদ প্রশ্ন করে।

'এইরকম আরও কিছু গোলমাল মেটাতেই বানানের নতুন নিয়ম তৈরি করা হয়েছে। তা নিয়ে খবরের কাগজে আর নানা জায়গায় সভা করে অনেকরকম আলোচনা হচ্ছে। সেসব তো ঠিকই আছে। কিন্তু এই নতুন নিয়মে সব না হলেও অনেক সংশয় কাটানো গেছে আপাতত', ভোলানাথবাবু বললেন।

'সে কী শুনছি যে, সংশয় নাকি বেড়ে গেছে আরও।' প্রশ্নটা করলেন লাবণ্য।

'বলছি তো সব সংশয় কাটেনি; তবে অনেক সংশয়ই কেটে গেছে। যেমন ধরুন এখানে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে সংস্কৃত থেকে হুবহু যেসব শব্দ বাংলায় এসেছে সেগুলি ছাড়া আর কোনও শব্দে দীর্ঘ-ঈ, দীর্ঘ-ঊ, মূর্ধন্য-ণ, মূর্ধন্য-ষ, অন্তঃস্থ-য খণ্ড-ত(ৎ) হবে না। সেই কারণেই এখন বাড়ি-শাড়ি-গাড়ি-খুশি-উনিশ-কুমির-পাখি সব হ্রস্বই বা হ্রস্ব-উ। আর হিরে-চুন-পুব হ্রস্ব-ই বা হ্রস্ব-উ। সেইভাবে দেশি, বিদেশি, বাঘিনি, কাবুলি, বিলাতি সব শব্দে হ্রস্ব-ই। বুঝলে?'

'হ্যাঁ এটা তো বেশ সোজা ব্যাপার। তাহলে পুজোও তো হ্রস্ব-উ দিয়েই লিখব।' জিগ্যেস করে বুলবুল।

'হ্যাঁ অবশ্যই, পুজোর মতো ধূলিতেও দীর্ঘ-ঊ, কিন্তু ধুলোতে হ্রস্ব-উ। তাই বলে উৎসাহের চোটে সমস্ত সংস্কৃত শব্দে আবার দীর্ঘ-ঈ দীর্ঘ-ঊ বসিও না যেন। যেমন, কৃষি, ক্রিয়া, পরিচিতি, মিশ্রিত এরকম আরও অনেক অনেক সংস্কৃত শব্দের হ্রস্ব-ই গুলো হ্রস্ব-ই-ই থাকবে।'

'তা তো বটেই। তা তো বটেই।' মাথা নাড়ল কালাচাঁদ।

'এই কারণেই এখন শেক্সপিয়র-এ দেখি হ্রস্ব-ই লিখতে, গ্রিনে দেখি ফিল্ডে দেখি আবার ক্রিমেও দেখি হ্রস্ব-ই লিখতে।'

'ঠিক বলেছ। অনেকে বলবে, ওই যে ইংরাজিতে যেহেতু ডবল-ই বা ই-এ আছে তাই দীর্ঘ-ঈ দিয়ে লেখ। সেসব শোনার কোনও দরকার নেই। সোজাসুজি সব ইংরাজি শব্দের বাংলা বানানে হ্রস্ব-ই, হ্রস্ব-উ লিখবে। সেটাই ঠিক।' জোরের সঙ্গে বুঝিয়ে দিলেন ভোলানাথবাবু। 'আচ্ছা, হালে খবরের কাগজে, পত্রিকায় কাহিনী শব্দের নতুন বানানটা চোখে পড়েছে নিশ্চয়ই।'

'হ্যাঁ। কেন পড়বে না। ইস কী বিচ্ছিরি লাগে দেখতে।' বলে উঠলেন লাবণ্য।

তুমি বাংলায় আসা যেসব শব্দ সংস্কৃত নয়, তাদের বানানে হ্রস্বই লেখার ব্যাপারটা মানো তো! মানো তো আলমারি, ফ্রিজ বানানে আলমারী বা ফ্রীজ দীর্ঘ-ঈ দিয়ে লেখার কোনও মানে হয় না।' ভোলানাথবাবু লাবণ্যকে বললেন।

লাবণ্যও জানালেন সত্যিই ওইসব শব্দ দীর্ঘঈ দিয়ে লেখার কোনও মানে হয় না। 'তাহলে বলো', ভোলানাথবাবু বললেন, 'হিন্দি কহানি থেকে বাংলায় আসা কাহিনি-তে কেন খামোকা দীর্ঘ-ঈ দিতে যাব?'

'কাহিনি হিন্দি থেকে এসেছে বুঝি?' লাবণ্য বিস্মিত!

বুলবুল বলল, 'তবু দেখার একটা ব্যাপার আছে না?'

ভোলানাথ বললেন, 'আসলে কী জান বাহিনীতে হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ঈ দেখে আমাদের চোখ অভ্যস্ত তার সঙ্গে শেষে ন-এ দীর্ঘ-ঈ লেখার একটা বহু পুরোনো চল ছিলই। কারণ স্ত্রীলিঙ্গ করা হলেই আগে গয়লানী, মেথরানী, চৌধুরানী, রানী লেখার চল ছিল। স্ত্রীলিঙ্গে ওই ন-ও দীর্ঘ-ঈ লেখার অভ্যাসটাও বদলে যাবে। কারণ, এখন তো ওগুলোও সব হ্রস্ব-ই হয়ে গেছে। এই বদলটা যদি প্রতিদিন না বুঝতে পারো তো ভাষা বোঝা আর হবে না।'

রিমঝিম বলল, 'সবই তো বুঝলাম কিন্তু ওই শ্রেণি, ধরণি, তরণির কী হল? ওগুলো তো সংস্কৃত শব্দ হুবহু বাংলায় এসেছে। ওখানে হঠাৎ হ্রস্ব-ই হতে যাবে কেন?'

'রিমঝিম, আজ আমার একটু তাড়া আছে। দীর্ঘদিন রেশন থেকে চাল-ডাল কিছু নিইনি। আজ হ্রস্ব পরিমাণ হলেও নিতে হবে। নাহলে রেশন কার্ডটি বাতিল হলে তার পুনরুদ্ধার এক দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপার। তাই ওই শ্রেণি-সমস্যার সমাধান কাল করব। শুধু ওটা কেন এই হ্রস্ব নিয়ে বিবাদ দীর্ঘ, তাতে দীর্ঘ সময় লাগবে। আজকের ব্যাপার নিয়ে আরও অনেক কথা আছে। পরে বলছি।' তড়িঘড়ি কাঁধের ঝোলা থেকে রেশন কার্ড আর থলি বের করতে গেলেন ভোলানাথবাবু ঝুপ্ করে বেরিয়ে এসে পড়ল কয়েকটা বই। তিনি সেদিকে লক্ষ না করেই বেরিয়ে গেলেন।

সবাই অবাক! ভোলানাথবাবুর ব্যাগেও কয়েকটা স্কুলপাঠ্য বই এবং সেগুলো সবই ষষ্ঠ সপ্তম 'শ্রেণি'র জন্য!

অঙ্কের মজা!

স্বপ্নাভ রায়চৌধুরী

অঙ্কের মজায় এই যে আমি টুসিকে মাতিয়ে রাখি, তাতে ওর যেমন অঙ্ক শেখার জন্য উৎসাহ বেড়েছে, তেমনই, 'লজিক'-এও নিপুণ হয়ে উঠেছে। পাড়ায় চোর ধরা পড়েছিল কাল রাতে। সে কী উত্তেজনা! চুরি করতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়েছে। আমি বাধা না দিলে মার খেত খুব বেচারি। থানায় ফোন করে পুলিশ ডাকিয়ে, সাক্ষী দিয়ে চোরকে হস্তান্তর করলাম। টুসি বলল, 'মৃত্যু অনিবার্য।'

আমি বললাম, 'যাঃ, চুরি করলে মৃত্যুদণ্ড হয় না। জেল হবে।' হঠাৎ একটা পুরোনো ধাঁধা মনে পড়ে গেল। আমার ছোটবেলায় শেখা। সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশন করলাম টুসির সামনে।

'একজন অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান ডাকাত ধরা পড়েছে। তার মৃত্যুদণ্ড হবেই এমন অপরাধ সে করেছে। মৃত্যুদণ্ডই হল। কিন্তু বিচারক ডাকাতটির বুদ্ধির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বললেন— 'শোন হে, তোমার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। তোমাকে হয় জলে ডুবিয়ে, নয় আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে। এখন, তোমাকে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করতে হবে। সেটা যদি সত্যি হয়, তুমি জলে ডুবে মরবে, মিথ্যে হলে আগুনে পুড়ে।'

ডাকাত এক মিনিট ভেবে এমন এক ভবিষ্যদ্বাণী করল যে, বিচারক মুচকি হেসে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন।

— বল তো টুসি, কী সেই ভবিষ্যদ্বাণী?'

গত সংখ্যার উত্তর

অমলের বয়স ১২ বিমলার ১০ কমলের ৭ ইরাবতীর ৫

সাবাশ!

অভিষেক ভট্টাচার্য (৪৬৬০) টুসির চেয়েও ভালো শিখে গেছে অঙ্কের মজা। পেনসিলের ধাঁধার যে সমাধান আমি করতে পেরেছিলাম, টুসির কেনা পেনসিলগুলোর দামের সঙ্গে তা মিলে গিয়েছিল বলেই টুসি সন্তুষ্ট হয়েছিল।

অভিষেক জানিয়েছে অন্য একটা সমাধান। তার সমাধানে দাম হল, ১ টাকা, ১ টাকা, ২ টাকা এবং ৪ টাকা। এদেরও যোগফল আর গুণফল সমান। সাবাশ অভিষেক!

শব্দ-সন্ধান

বর্ণবণিক

নীচে মোট ছ'টি সংকেত দেওয়া হল। এর প্রথম পাঁচটি সংকেত থেকে তৈরি হবে একটা করে পাঁচ বর্ণওয়ালা শব্দ। এবার প্রতিটি শব্দের প্রথম বর্ণগুলিকে নীচের পাঁচটি গোলঘরে বসিয়ে দাও, ওইগুলোকে উল্টোপাল্টে দিলেই পাবে ষষ্ঠ সংকেতের উত্তর।

গায়ে গায়ে লেগে লেগে থাকা বাড়িঘর

পড়া ছেড়ে অনেকের এদিকে নজর

সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে দল ভারী করা

এই সব টেনে এনে তবে চুরি ধরা

এত সব হাতে নিলে বেড়ানোটা মাটি

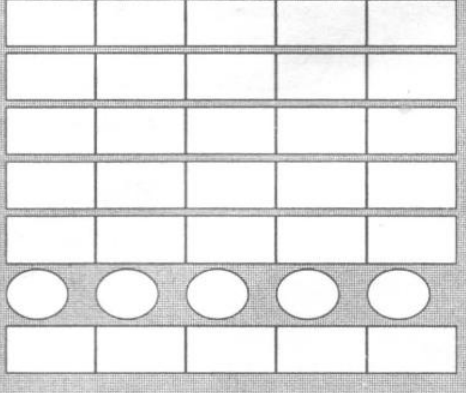

এইখানে নাচগান তবলায় চাঁটি

গত সংখ্যার শব্দসন্ধান-এর উত্তর

● স্থাপত্যশিল্প ● প্রবহমান ● মজুমদার ● হাটবাজার ● নরসুন্দর ● মহাপ্রস্থান

জানো কি?

ছবির মাধ্যমে জায়ান্ট পাণ্ডা আমাদের বেশ পরিচিত জন্তু, যদিও আমরা অনেকেই তাকে চোখে দেখিনি। দক্ষিণ-পশ্চিম চিনের সেচুয়ান উপত্যকায় পাহাড় ঘেরা অঞ্চলে বাস করে জায়ান্ট পাণ্ডারা, আকারে অনেকটা বড়ো, প্রায় ভালুকের মতন চেহারা—অবশ্য তাদের খাদ্য খালি বাঁশের কোঁড়। ওই একটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ আর মোট জনসংখ্যা ১০০০-এরও কম বলে বিশ্ব বন্যপ্রাণী তহবিল একে বেছে নিয়েছে নিজেদের লোগো হিসেবে। সেচুয়ানের সবচেয়ে বড়ো সংরক্ষিত এলাকা উলং জায়ান্ট পাণ্ডা রিজার্ভ। সেখান থেকে সম্প্রতি ৬টি পাণ্ডাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম সেচুয়ানের ইয়ান বনাঞ্চলে। এর সাহায্যে তাদের পুরোনো বিচরণভূমি ফিরে পাবে পাণ্ডারা।

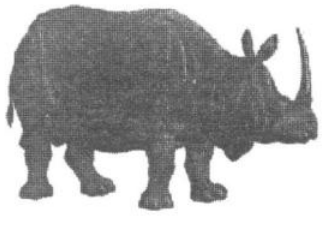

গণ্ডারের চামড়া বলে একটা কথাই আছে। আসলে গণ্ডারের চামড়া কত পুরু? বিজ্ঞানীরা মেপে দেখেছেন যে, ভারতীয় গণ্ডারের মোটা ভাঁজ করা চামড়া প্রায় ২৫ মিলিমিটার পুরু। এর জন্য গণ্ডারের শরীর অনেক ভারী হয়ে গেছে, এত পুরু চামড়া ভেদ করে কোনও মাংসাশী প্রাণী এদের মাংস খেতে পারে না। তাই প্রকৃতিতে গণ্ডারের শত্রু খুব কম। তাহলে কী হবে, এত পুরু চামড়া দিয়েও ঠেকানো যায় না আজকের আধুনিক বন্দুকের হাই-পেনিট্রেশন বুলেট। গণ্ডারের একমাত্র শত্রু মানুষের বন্দুকের গুলিতেই তারা মারা পড়ছে খড়্গের লোভে। শুধু ভারতে নয়, দেখা গেছে সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকাতে গত দশ বছরে মারা পড়েছে ২৫,০০০ গণ্ডার।

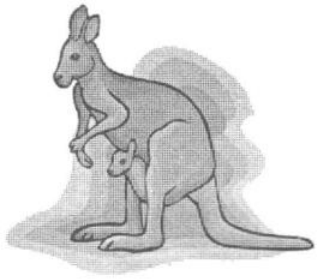

কেবল গণ্ডার নয়, বন্দুকের গুলিতে মারা পড়েছে লক্ষ লক্ষ ক্যাঙারু। অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় পশু এই ক্যাঙারু। ক্যাঙারু শব্দটা এসেছে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের ভাষা থেকে, অবশ্য ক্যাঙারু ছাড়াও এই গোষ্ঠীর প্রাণীদের ওয়ালাবি, ওয়ালারু, পোটোরু ইত্যাদি নানা নামেও ডাকা হয়। কিন্তু জাতীয় পশু হলে কী হবে, অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দাদের অনেকেই মনে করেন ক্যাঙারুদের উৎপাতে তাঁদের চাষবাস, পশুপালন সবই বিঘ্নিত হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা মাত্র ২ কোটি আর সেখানে ক্যাঙারুদের সংখ্যা সম্ভবত ৬ কোটির কাছাকাছি, অর্থাৎ জনপিছু ৩টে করে ক্যাঙারু। আগেও অস্ট্রেলিয়া সরকার গড়ে বছরে ১৫ লক্ষ ক্যাঙারু মারার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এখন ২০০৩ সাল থেকে ক্যাঙারু মারার কোটা হল বছরে ৭০ লক্ষ।

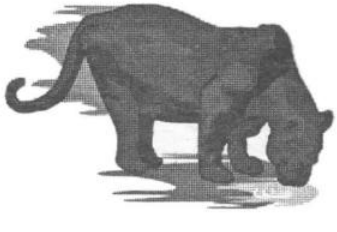

বাঘের বাচ্চা, আমরা প্রকৃতির কোলে না হোক, চিড়িয়াখানায় মাঝে মধ্যে দেখতে পাই। কিন্তু সম্প্রতি দুনিয়া জুড়ে খবর বেরিয়েছে একজোড়া রয়াল বেঙ্গলের বাচ্চার, যাদের নাম রাফায়েলা আর মারিয়েটা। নামটা একটু অদ্ভুত ঠেকছে? এদের মায়ের নাম মোচা, যদিও তিনি জাতিতে খাঁটি বাঙালি। এই ব্যাঘ্র শিশুরা জন্মেছে গত বছর ১২ জুলাই কিউবার রাজধানী হাভানার চিড়িয়াখানায়। শুধু তাই নয়, এদের মায়ের সিজারিয়ান অপারেশন করে প্রসবের ব্যবস্থা করেন ভেটেরিনারি ডাক্তার ওলগা আবালি। যেহেতু কিউবাতে এই প্রথম বাঘের সফল প্রসব হল, এ নিয়ে দেশ জুড়ে বেশ হৈ চৈ চলছে। আমরাও আনন্দিত।

সার্কাসে অনেক বাঘ-সিংহ খেলা দেখাত। এখন বন্যপ্রাণী আইনে এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তা বারণ হয়েছে। সারা দেশের বিভিন্ন সার্কাস থেকে উদ্ধার করে ৪৫টি সিংহ আনা হয়েছে ব্যাঙ্গালোরের কাছে বানরঘাটা ন্যাশনাল পার্কে। সেখানে একটি রেসকিউ সেন্টার তৈরি করা হয়েছে যেখানে সিংহরা বিশ্রাম নেবে। অধিকাংশ সিংহই অসুস্থ এবং যথেষ্ট দুর্বল। এদের আর চাবুক বা আগুনের ছ্যাঁকা খেয়ে নতুন নতুন খেলা শিখতে হবে না, এরা বিশ্রাম এবং খেলাধুলো করে সময় কাটাতে পারবে।

আগে রাস্তা ঘাটে শকুন বসে থাকত প্রায় সবসময়েই। এখন তাদের আর দেখা যাচ্ছে না। সম্প্রতি গবেষকরা হিসেব করে দেখেছেন যে শকুনের সংখ্যা কমে গেছে শতকরা ৯০ ভাগ। কেন যে এত শকুন মারা পড়েছে তা ঠিক জানা নেই, তবে এর জন্য দায়ী সম্ভবত কোনও অজানা ভাইরাস। বোম্বাই ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির ডিরেক্টর রহমানি সাহেব মনে করেন চিড়িয়াখানায় কিছু শকুন রেখে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা উচিত। শকুন দেখতে খুব সুন্দর না হতে পারে, প্রকৃতিতে মরা, গলা-পচা জন্তু জানোয়ার খেয়ে এরা মানুষের উপকারই করত। শকুনের মৃত্যুতে সবচেয়ে চিন্তিত মুম্বইয়ের পার্সিরা। তাদের টাওয়ার অফ সাইলেন্স আর ব্যবহার করা যাচ্ছে না, কারণ মৃতদেহ সৎকারের জন্য প্রয়োজনীয় শকুন আর নেই।

অবলুপ্ত (?) সরীসৃপ খুঁজে পাওয়া গেল উড়িষ্যার চিলিকা অঞ্চলে। ১৯১৭ সালে জুলজিক্যাল সার্ভের ডিরেক্টর স্ট্যানলি কেম্প এই সরীসৃপটি খুঁজে পেয়েছিলেন চিলিকা হ্রদের বারকুদা গ্রামে। গ্রামের নাম অনুসারে এর নামকরণ হয় Barkudia insularis। সরীসৃপ হলেও এর পা নেই এবং দেখতে অনেকটা সাপের মতোই, যদিও এরা গিরগিটির নিকট আত্মীয়। গত বছর অক্টোবর মাসে ঐ বারকুদা দ্বীপে আবার খুঁজে পাওয়া গেছে চারটি বিরল সরীসৃপ।

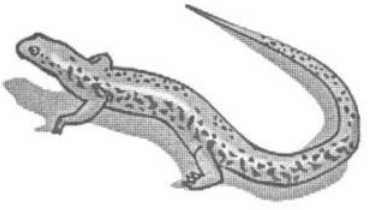

ধনেশ পাখি বা হর্নবিল আমাদের সকলেরই জানা। আকারে বেশ বড়ো আর ঠোঁটটা প্রকাণ্ড। ঠোঁটের উপরে আবার একটা বড়ো হাড়ের মতন আছে। এই শক্তিশালী ঠোঁট দিয়ে যে কোন রকম ফল বা বাদাম ভেঙে খেতে ওদের অসুবিধা হয় না। এই ঠোঁটে করেই খাবার এনে মা-পাখিকে খাওয়ায় বাবা-পাখি বা সন্তানদের খাওয়ায় বাবা-মা। সারা পৃথিবীতে আফ্রিকা থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে ধনেশের ৪৫টি প্রজাতি, আকারে ৫০ থেকে ১৫০ সেমি, ঠোঁটের রঙ হলদে, লাল বা কালো। ভারতেই পাওয়া যায় ৪টি প্রজাতির ধনেশ। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এদের শরীর থেকে নিষ্কাশিত তেল টোটকা হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে বলে ধনেশরা আজ মৃত্যুপথযাত্রী।

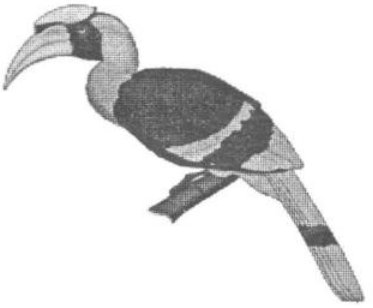

নীল তিমি পৃথিবীর বৃহত্তম জন্তু, গড় দৈর্ঘ্যে ৩০ মিটার, গড় ওজন ৫০ টন। দীর্ঘদিন ধরে নীল তিমি ও অন্যান্য তিমি প্রজাতি মারা হয়েছে চামড়া, চর্বি ও মাংসের জন্য আর তাদের সংখ্যা অত্যন্ত কমে গেছে। গত কয়েক বছর ইন্টারন্যাশনাল হোয়েলিং কমিশন তিমি শিকার বন্ধ করে দিয়েছেন। সারা পৃথিবীতে পরিবেশবাদীরা এই খবরে খুশি হলেও অখুশি জাপান ও আইসল্যান্ড। আইসল্যান্ড সরকার এই বারণ সত্ত্বেও তিনটি জাহাজ পাঠিয়েছেন সমুদ্রে ৩৮টি মিংকে তিমি শিকারের জন্য। তাঁদের মতে এই শিকার নাকি বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য প্রয়োজন!

মেট্রোর নাম মোবিয়াস

রাজর্ষি রায়চৌধুরী

২০৬৮ সালের ৫ জুন কলকাতা, তথা বঙ্গদেশ, তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন, যাকে বলে রেড লেটার ডে। এই দিন কলকাতা মেট্রোতে বালিগঞ্জ-পার্কসার্কাস শাট্‌ল্ যোগ হবার ফলে কলকাতায় যে কোনও জায়গা থেকে যে কোনও জায়গায় যাবার অসাধারণ সুব্যবস্থা হয়েছে। মেট্রোযাত্রীদের এখন একবার পাতালে প্রবেশ করে ট্রেনে উঠলেই ব্যাস্! মাটির উপরে ভিড়, জল-কাদার মধ্যে রাস্তা পারাপার করার কোনও ব্যাপারই আর রইল না, অন্তত এই কথাই টিভি আর রেডিওতে প্রচারিত হয়েছিল রেলমন্ত্রী সোনালি ফিতে কাটবার সময়।

মুশকিল হল বেলা সাড়ে বারোটার সময়। ধর্মতলা থেকে বিড়লা মন্দিরগামী ১৩৪ নম্বর ট্রেনটি ছাড়ল, কিন্তু পরের স্টেশন লেনিন সরণিতে এসে আর পৌঁছল না। লেনিন সরণির কন্ট্রোলার প্রথমে এসপ্ল্যানেডে ফোন করল; করে উত্তর পেল ট্রেন যখন ছাড়বার, তখনই ছেড়েছে। কন্ট্রোল বোর্ডে লাইনের কোনওখানে কোনও গলদ বা বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের চিহ্ন নেই; বিশেষত একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে লোডশেডিং কথাটা ছেলেমেয়েরা শুধু ইতিহাস-বইয়ের পাতাতেই চিনেছে। বারোটা সাঁইত্রিশ মিনিটে গম্‌গম্ করে পরের ট্রেন এসে উপস্থিত হয়েছে। ছেড়ে চলেও গেল যথারীতি। কন্ট্রোলারের দুশ্চিন্তা বাড়ল — একটাই আপ্ লাইন। ট্রেনটা গেল কোথায়? লাল রঙের এমার্জেন্সি ফোন তুলে লাইন সুপারভাইজারকে বলতেই তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন 'আগে জানাতে পার নি? আরও পাঁচটা ফোন এসেছে যথাক্রমে লোয়ার সার্কুলার রোড, বেকবাগান আর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড থেকে, ১৩৪ নম্বর কোনওখানেই এসে পৌঁছয়নি।'

আধঘণ্টার মধ্যেই চতুর্দিকে ফোন করা আরম্ভ হয়ে গেল। যদিও ট্রেন যথারীতি আসছে-যাচ্ছে। অবশেষে মেট্রো রেল অধিকর্তা বিনয় পুরকায়স্থ রাত্রি সাড়ে দশটার সময় বললেন 'ট্রেন কোথায় গেল বুঝতে পারছি না— পুলিসে খবর দেওয়া উচিত? আমি বাড়ি চললাম। কোনও খবর থাকলে ফোন কোরো।' জুনিয়র একজন অধিকর্তা অগত্যা লালবাজারে ফোন করলেন।

পরের দিন বিভিন্ন খবরের কাগজ ও অন্যান্য সংবাদমাধ্যমের দ্বারা "নিখোঁজ মেট্রো" বা "ট্রেন ভ্যানিস"-এর খবর অনেকেই পড়লেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে একজনই খবরটা পড়লেন তিন-চার বার। আর পড়ার পরে ঠিক তার পরের খবরটা, ("ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন নিয়েছে" — ওয়ান ডে ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে) পড়ার পরেও তাঁর মুখে হাসি ফুটল না, বরং ভুরুদুটো কুঁচকেই রইল, জামালুদ্দিন আনসারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর গণিত, মানে Higher Mathematics-এর রিডার। পরের দুদিন জামালুদ্দিন আনসারি বাড়িতেই বসে কম্পিউটর এবং কাগজ-পেনসিলে নানান্ হিজিবিজি নকশা ও ক্যালকুলেশান করলেন, সাত-তলা সম্বলিত কলকাতা মেট্রোর একটা অত্যাধুনিক প্ল্যান ইন্টারনেট থেকে জোগাড় করে প্ল্যাস্টিসিন তার আর দেশলাই কাঠি দিয়ে তৈরিও করলেন। তারপর বালিগঞ্জ-পার্কসার্কাস শাট্‌লটা যোগ করে আরও ছ-সাত ঘণ্টা হিসেব-নিকেশ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। অবশ্য সেটা দুঃখের না আনন্দের সেটা বোঝা গেল না।

মেট্রোরেল অধিকর্তার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে আনসারির লাগল তিনদিন। এর মধ্যে অন্তত দেড় হাজার পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে ১৩৪ নম্বরকে খুঁজে বার করতে। অনেক সাধারণ (বা অসাধারণ) মানুষও, পুরস্কারের আশায় রেল অধিকর্তাকে জানিয়েছেন যে তাঁরা জানেন ১৩৪ এর কী হয়েছে, এর মধ্যে বিশিষ্ট হচ্ছেন, বেহালা কালীবাড়ি স্টেশনের বিখ্যাত পাতালবাবা — তিনি বলেছেন এ সবই বাসুকীর কাজ। বাসুকী মেট্রো রেলের চেহারার সঙ্গে নিজের মিল খুঁজে পেয়ে নিজের টেরিটরি রক্ষার চেষ্টা করেছে। প্রধানত পাতালবাবার সঙ্গে মিটিংয়ের ফলেই মেট্রোরেল অধিকর্তার মেজাজ গরম; ফলে অ্যান্টাসিড খাওয়ার হারও বেড়ে গেছে। এবং সেই কারণেই জামালুদ্দিনের তিনদিন দেরি হয়ে গেল।

'মিঃ পুরকায়স্থ, ১৩৪ নম্বরের কী হয়েছে আমি জানি না, তবে একটা আন্দাজ আছে।' এই কথা শুনতেই বিনয়বাবু ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। এই প্রথম কেউ

তাঁকে বলল যে ১৩৪ নম্বর ট্রেন যে কীভাবে হারিয়ে গেছে, তা সে জানে না! কিন্তু পরে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ব্যাখ্যা শোনার পর তিনি আবার সিটে এলিয়ে পড়লেন অবশ্য এয়ার কণ্ডিশনারটা আরও দু-দাগ বাড়িয়ে দিয়ে — বদ্ধপাগল আনসারি বলে কী? এ তো পাতালবাবার ওপরে আরও কয়েক কাঠি!!

জামালুদ্দিন আনসারি বললেন 'জানি আপনার পক্ষে ব্যাপারটা বোঝা মুশকিল। উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি।' বলে পকেট থেকে একটা লম্বা কাগজের রিং বার করে বললেন, 'একটা কাগজে কটা সারফেস্ হয়?'

বিনয়বাবু বললেন 'কেন? দুটো, এপিঠ আর ওপিঠ।'

জামালুদ্দিন বললেন, 'তাহলে আপনি যদি পেন দিয়ে দাগ দেন, তাহলে পেন না তুলে দুদিকে দাগ দেওয়া অসম্ভব। তাই তো?'

'অবশ্যই!'

'তাই কি? এই কাগজের রিংটার ওপরে এই পেন দিয়ে দাগ দিন তো পেনটা না তুলে। স্টার্টিং পয়েন্টে ফিরে এলে বলবেন।'

'যত্তসব পাগল ছাগলের ব্যাপার', বলতে বলতে নিবিষ্টমনে আড়াই মিনিট ধরে কাগজে দাগ দিয়ে বিনয়বাবু অবাক্। দাগ পড়েছে কাগজের দুদিকেই কিন্তু তিনি একবারের জন্যেও পেন তোলেন নি কাগজ থেকে! জামালুদ্দিন একটু মুচকি হেসে পকেট থেকে একটা ছোট্টো কাঁচের বোতল বার করে বিনয়বাবুর টেবিলে রেখে বললেন— 'দেখছেন তো এই বোতলটা, এর নাম ক্লাইন্ বট্‌ল্। দেখতেই পাচ্ছেন, মনে হচ্ছে দুটো বোতল যেন একটা মধ্যে আর একটা ঢোকানো আছে। এবারে বাইরে বোতলে জল ঢালুন তো?'

জল ঢেলে বিনয়বাবু হতভম্ব! 'ভেতরের বোতলে জল যাচ্ছে কী করে? এ কী ম্যাজিক দেখাচ্ছেন নাকি?'

জামালুদ্দিন বললেন — 'এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে উচ্চতর গণিতের একটা বিশেষ অ্যাপ্লিকেশনে। এর নাম টোপোলজি। ধরুন এই যে মোবিয়াস স্ট্রিপ, এর এপিঠ-ওপিঠ, দুপিঠ, কিন্তু কন্‌টিনিউইটি একটাই। অর্থাৎ একটা কাগজের যে নগণ্য পুরুত্ব, সেটাকে আমি বাড়িয়ে নিয়েছি একটা প্যাঁচ দিয়ে। তেমনি এই ক্লাইন বট্‌ল্ যা একসঙ্গে ভেতরে এবং বাইরে থাকে!'

'কিন্তু ১৩৪?!'

'বলছি বলছি, আপনাদের এই যে মেট্রোর সিস্‌টেম — এই সাত তলা লাইন যে সাপের মতো কিলবিল করে ছড়িয়ে আছে কলকাতার তলায়, এর মধ্যে বালিগঞ্জ-পার্কসার্কাস শাট্‌ল্ যোগ করার পরে এর টোপোলজিক্যাল জটিলতা বেড়ে গেছে অসম্ভবভাবে। ফলে সমস্ত নেটওয়ার্কটাতে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যে কোনও সময় না থেমে চলে যাওয়া যায়।'

'তাহলে ১৩৪ আছে কোথায়?'

'জানি না, তবে সিসটেমের বাইরে যায়নি এটা তো অবশ্যই।'

'হ্যাঁ সিসটেমের মধ্যেই আছে, কারণ, কারেন্ট খরচ করছে ঠিকই।'

'কিন্তু আপনারা খুঁজে পাচ্ছেন না এই তো? অর্থাৎ ১৩৪ আর এই ডাইমেন্‌শনের মধ্যেই নেই।' কয়েক মিনিটের কবরের নিস্তব্ধতার পর বিনয়বাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন — 'কী আবোলতাবোল বকছেন মশাই। এ কী

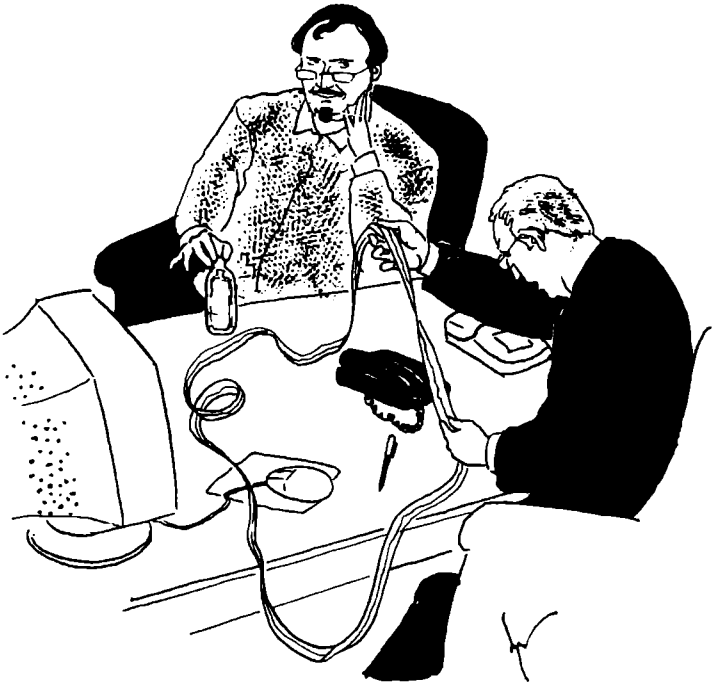

সায়েন্স ফিক্‌শন্ পেয়েছেন না কী? অন্য ডাইমেনশনে চলে গেলে সিস্‌টেমের মধ্যে থাকবে কী করে? প্রমাণ করতে পারবেন এ সব?'

'দেখুন, প্রমাণ হয়তো করতে পারব না, তবে আমরা ম্যাথ্‌ম্যাটিশিয়ান্‌রা বলি যে ডাইমেনশন শুধুমাত্র চারটে, মানে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা আর সময়, এই চারটের বাইরেও আরও আছে, কিন্তু সেগুলো এত কম্প্যাক্ট। মানে ঘন সন্নিবদ্ধ, যে সেগুলো আমাদের অনুভূতি দিয়ে

বোঝা বা, উপলব্ধির মধ্যে আসে না। তবে প্রমাণ অঙ্ক কষে করতে পারব না।'

'তাহলে আপনি কেমন ম্যাথ্‌ম্যাটিশিয়ান মশাই?'

'আসলে আমি তো টোপোলজিস্ট নই, আমি অ্যালজেব্রার এক্সপার্ট। তবে টোপোলজি একটু-আধটু বুঝি, এই আর কী। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড়ো টোপোলজিস্ট তো কলকাতাতেই থাকেন, এই তো আমাদের কলিগ — সত্যব্রত বসু।'

'তাহলে ডাকুন তাঁকে।'

এইবার জামালুদ্দিন একটু আমতা আমতা করে বললেন 'ওঁকে আসলে গত কয়েকদিন ধরে পাওয়া যাচ্ছে না। উনি প্রতিদিন মেট্রো ধরে ধর্মতলা থেকে সায়েন্স কলেজ যেতেন কিনা। আমার বিশ্বাস উনি আছেন ওই ১৩৪ নং ট্রেনেই!'

'সর্বনাশ! তাহলে উপায়?'

'একটা কাজ করতে পারেন ...'

জামালুদ্দিনের কথামতো পরের দিন রাত্রি দুটোর সময়ে মেন্টেন্যান্সের অজুহাতে সমস্ত মেট্রো নেটওয়ার্কের বিদ্যুৎ-সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হল। প্ল্যান ছিল তাহলে রিমোট সেন্সরে ১৩৪ কে খুঁজে পাওয়া যাবে।

গণ্ডগোল হল যখন চাঁদনি, বেলঘরিয়া, বেহালা শকুন্তলা পার্ক, তিনটি স্টেশন থেকে একসঙ্গে রিপোর্ট এল যে আর নিকটবর্তী রেললাইনে ১৩৪ নং ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটি জায়গার রেললাইনেই এক একটা বাঁকের পরে। ফলে স্টেশন থেকে বোঝাও যাচ্ছে না।

বিনয়বাবু পরের দিন রাগারাগি আরম্ভ করলেন 'একি ইয়ার্কি পেয়েছেন নাকি মশাই! একসঙ্গে তিনটে জায়গা বলল বাঁকের পরেই ১৩৪ দাঁড়িয়ে রয়েছে!!'

ইতিমধ্যে যাদবপুর, বিশ্বভারতী ও কলকাতা ইউনিভার্সিটির তিনজন টোপোলজিস্ট এসে জামালুদ্দিনের আঁকজোক পরীক্ষা করেছেন, ও তিনজনেই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখি মন্তব্য করেছেন। তাদের মধ্যে একজনই শুধু বলেছেন জামালুদ্দিনের ক্যালকুলেশনটা একেবারে অর্থহীন না হলেও হতে পারে। কিন্তু সবারই মতামত, 'সত্যব্রত বসু কোথায়? এসব তো উনিই বলবেন!'

জামালুদ্দিনের পরের পরামর্শ সমস্ত মেট্রো নেটওয়ার্ক থেকে সমস্ত তুলে নেওয়া হল এক দিনের জন্য। ১৩৪ যে বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে সেটা আওয়াজ শুনে বোঝা গেল। যেমন— বিকেল ৪-৩০ শেয়ালদা স্টেশন। এই জংশনটা মাল্টিস্টোরিড, একটা ট্রেন যাচ্ছে। দুটো লেভেল থেকে প্রহরীরা দৌড়ে অন্য লেভেলে যেতে গিয়ে মাঝপথে দড়াম করে কলিশনও খেল। কিন্তু আওয়াজ শোনা ছাড়া, কিছুই দেখা গেল না। রিমোট সেন্সরে মনে হল, চাঁর পাঁচ মাইল দূরের কয়েকটি স্টেশন দিয়ে একসঙ্গে একটা ট্রেন যাচ্ছে!

বিনয়বাবু পরের দিন জামালুদ্দিনকে বললেম 'ও কে আই বিলিভ ইউ! কিন্তু অন্য কোন ট্রেন আর নতুন করে হারায়নি কেন?'

জামালুদ্দিন উত্তর দিলেন 'দেখুন ব্যাপারটা নিয়ে আমিও ভাবিনি তা নয়। একদম ডেফিনিটলি বলতে পারছি না। তবে একটা হাইপোথিসিস আছে আমার। মনে হয়, এই দুটো জগতের মাঝামাঝি জায়গাটায় শুধু একটা ট্রেনই থাকতে পারে, অ্যাট এনি ওয়ান মোমেন্ট ইন টাইম। মানে একটা এক্সক্লুশন প্রিন্সিপ্‌ল্‌'এর ব্যাপার আছে। যেমন ধরুন একটা এনার্জি লেভেলে শুধু একটাই ইলেকট্রন থাকতে পারে। তবে সঙ্গে সঙ্গে বালিগঞ্জ-পার্কসার্কাস শাট্‌ল্‌ বন্ধ করে দিতে হবে। মুশকিল হচ্ছে, আপনারা যদি এখ্‌খুনি শাট্‌লটা বন্ধ করে দেন, তবে ১৩৪-এর ফিরে আসার আর কোনও উপায় থাকবে না। যাই হোক আমার অ্যাডভাইস আপনারা নেবেন কিনা জানি না, তবে আমার দায়িত্ব এখানেই শেষ।'

শেষ বললেও এর পর সপ্তাহ তিনেক জামালুদ্দিন আর মেট্রোয় চড়লেন না। খবরের কাগজে হারিয়ে যাওয়া মেট্রোর ট্রেনের খবরও ক্রমশ কমে আসতে লাগল। অবশেষে জামালুদ্দিনও আবার মেট্রোয় চড়তে শুরু করলেন।

মাস তিনেক বাদে, সায়েন্স কলেজ স্টেশন থেকে একটা ট্রেনে উঠলেন জামালুদ্দিন। সামনের সিটে বসা লোকটা যে খবরের কাগজটা পড়ছিল সেটা দেখেই হতভম্ব প্যাসেঞ্জারটির হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিলেন তিনি, লোকটা তেড়েমেড়ে ওঠার আগেই তিনি বললেন, 'আজকে অক্টোবরের ২৮ তারিখ! আপনি ৫ই জুনের কাগজ পড়ছেন কী করে?' বলেই তিনি এমার্জেন্সি ব্রেকের ওপর ঝাঁপালেন।

প্যাসেঞ্জারটি বলল 'ব্যাপার কী দাদা?'

জামালুদ্দিন বললেন, 'আজকের তারিখ কত?'

'কেন ৫ জুন'

'না ৫ জুন থেকে এই ট্রেনটিকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। তারপর চার মাস কেটে গেছে!

'পাগল নাকি! এই তো ধর্মতলা থেকে উঠলাম। যাব ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ।' ট্রেন তখন স্টেশনের প্রায়

শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। প্রচণ্ড উত্তেজিত জামালুদ্দিন লোকটির মাথা ধরে প্ল্যাটফর্মের আলোকিত ডিস্‌প্লের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওই দেখুন সময় আর তারিখ ! এবার বিশ্বাস হচ্ছে? আপনার শরীর কেমন? এই ট্রেনের আর অন্যদের?'

বাইরে আলোকিত বোর্ডে ২৮ অক্টোবর তারিখটা দেখে কম্পমান শরীরে ভদ্রলোক বসে পড়লেন বললেন, 'ভালোই, মানে এই আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত ভালোই ছিল।'

ট্রেনে তখন নানা ধরনের হট্টগোল আরম্ভ হয়েছে 'ট্রেন থামল কেন?' 'পাগলটাকে নামিয়ে দাও।' 'ডাক্তার লাগবে' ইত্যাদি। ইতিমধ্যে যারা বোর্ডটা দেখেছে কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছে না, তারা বাক্‌রহিত!

হন্তদন্ত ড্রাইভার ট্রেনের পেছনে আসতেই জামালুদ্দিন তাঁকে বললেন 'খবর্দার ট্রেন ছাড়বে না। এক্ষুনি স্টেশন সুপারভাইজারকে জানাও, মেট্রো হেডকোয়ার্টার্সে বিনয় পুরকায়স্থের সঙ্গে জরুরি দরকার।'

এই ক'মাসের ব্যাপারের সুবাদে সব স্টেশনের সুপারভাইজাররাই এখন জামালুদ্দিনের সুপরিচিত। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলেন বিনয়বাবুকে।

'ফিরে এসেছে, ১৩৪ ফিরে এসেছে। লোকজন সবাইকে নিয়েই। প্যাসেঞ্জারদের সবাই অক্ষত। শুধু ড্রাইভারটা দেখছি একটু হেদিয়ে পড়েছে। বিনয়বাবু, এখ্‌খুনি সায়েন্স কলেজ চলে আসুন। শাট্‌ল্‌টা বন্ধ করতে হবে।'

বিনয়বাবু বললেন, 'আসছি, কিন্তু আমি রাস্তা দিয়ে আসছি। ওই শাট্‌ল্‌ বন্ধ হবার আগে আমি আর মেট্রোয় উঠছি না।'

'১৩৪ ফিরে এসেছে, ফিরে এসেছে।' এই খবরটা মেট্রোরেলভবনকে কাঁপিয়ে দিল। উচ্ছ্বসিত বিনয়বাবু জামালুদ্দিনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে করতে বললেন 'ভেল্কি দেখালেন মশাই- এবারে ডাকুন আপনার টোপোলজির প্রফেসরকে। শাট্‌ল্‌টা বন্ধ করে দিই।'

হঠাৎ লাল টেলিফোনটা বেজে উঠল— '৪২৮ নং ট্রেন এন্টালি থেকে রিপোর্ট করে নি। পরের স্টেশনে তার পরের ট্রেন এসে উপস্থিত। শাট্‌ল্‌ বন্ধ করবেন না!'

হতচকিত বিনয়বাবু জামালুদ্দিনকে বললেন— 'সত্যব্রত বসু কোথায়?'

জামালুদ্দিন বললেন— 'জানি না, সায়েন্স কলেজেই তো ওঁর নামবার কথা যদি না অন্য কোথাও নেমে পড়ে থাকেন।'

A. J. Deutsch-এর *A Subway Named Moebius* অনুসরণে

ছবি : সায়ন চক্রবর্তী

হাতিদের দূরভাষ

গোপাল ভট্টাচার্য

হাতিদের অনুধাবন ক্ষমতা বিস্ময়কর এবং রহস্যময়। ধরা যাক, নামিবিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। বহুদূরে অ্যাঙ্গোলায় হাতির দল তা বুঝতে পেরে সেই দিকে জলের সন্ধানে ছুটে চলল। পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরের ঘটনার সংকেত তারা কোনও-না-কোনও রকমে ধরতে পারে এবং তাতে বিচলিত কিংবা আনন্দিত হয়।

এরকম আশ্চর্য ক্ষমতা হাতিদের এল কীভাবে? জীববিজ্ঞানী লাইনেট হার্ট সম্ভবত এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছেন। আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলি। সেই শব্দ সঞ্চালিত হয় বাতাসের মাধ্যমে। আর হাতিরা বাতাস ছাড়াও দূর দূরান্তে নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে মাটির মাধ্যমে। হাতি ছাড়া অন্য কোনও বড়ো স্তন্যপায়ী প্রাণী ভূকম্পনজনিত সংকেতের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে না।

হার্টের ছাত্র কেউটলিন ও'কনেল রডওয়েল লক্ষ্য করলেন কিছু হাতির অস্বাভাবিক আচরণ। তারা সন্ত্রস্ত হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে একটা পা ওপরের দিকে তুলে ধরছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে তাঁর মনে হয়নি হাতিদের এরকম আচরণের কোনও সঙ্গত কারণ আছে। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল, তারা কী মাটির মাধ্যমে কোনও সংকেত পেয়ে এমন করছে? ও'কনেল রডওয়েল তখন ডেভিসে অবস্থিত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হার্টের গবেষণাগারে কাজ করছেন, তাঁর মনে হল মাটিতে গুড় গুড় শব্দের সময় কিছু কিছু পতঙ্গ এক পা ওপরের দিকে তুলে তিন পা দিয়ে দৃঢ়ভাবে মাটিকে ধরে রাখে। সম্ভবত এইভাবে তারা আরও বেশি একাগ্রভাবে মাটির শব্দ শোনে বা ভূকম্পন অনুভব করে।

আফ্রিকা থেকে এই অভিজ্ঞতা নিয়ে ও'কনেল রডওয়েল মার্কিন মুলুকে ফিরে এসে হার্টকে সব জানালেন। হার্ট তাঁর ভূ-পদার্থবিদ ভাই রায়রন আরান্‌সনকে এই সব ঘটনার কথা জানালেন। হাতিরা কি ভূকম্পনজনিত তরঙ্গের মাধ্যমে দূর-দূরান্তে অন্যান্য হাতিদের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে? আরান্‌সন একজন ভূবিজ্ঞানী। তিনি ভূগর্ভস্থ তেল অনুসন্ধানের কাজ করছিলেন। এই সব ঘটনা শোনার পর তিনি সেই কাজ মুলতুবি রেখে হাতিদের যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর নজর দিলেন।

হার্ট এবং আরান্‌সন জানতেন হাতির ডাকের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যার ফলে সেই শব্দ মাটির মাধ্যমে চলাচল করতে পারে। হাতিরা কুড়ি হার্ৎজ কম্পাঙ্কে জোরে শব্দ করে। আরান্‌সন টেক্সাসে হাতিদের অভয়ারণ্যে ভূকম্পন সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য হাতির অবস্থান থেকে দশ মিটার এবং পঁয়তাল্লিশ মিটার দূরে মাইক্রোফোন রাখলেন। মাইক্রোফোনের ঠিক নীচে মাটির ভেতরে স্থাপন করলেন 'জিওফোন'। জিওফোন ভূকম্পন পরিমাপ করতে পারে। বাতাসের মধ্য দিয়ে শব্দ যে বেগে চলাচল করে, মাটির মাধ্যমে সেই বেগে যায় না। তার বেগ পরিবর্তিত হয়। শব্দপ্রবাহের এই বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে কোনও শব্দ বাতাসের মাধ্যমে আসছে, না মাটির মাধ্যমে আসছে তা সহজেই নির্ধারণ করা সম্ভব এই ব্যবস্থার সাহায্যে। সুতরাং কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থানে শব্দের উৎপত্তি হলে অন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানে বাতাসের মাধ্যমে এবং মাটির মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৌঁছাবে।

ভূকম্পনজনিত সংকেতের মাধ্যমে এক জায়গার হাতিরা অনেক দূরে দূরে থাকা হাতির পালের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে। পিছনে থাকা হাতির পাল চোখের আড়ালে চলে গেলেও এগিয়ে থাকা হাতির পাল একই অভিমুখে চলতে থাকে। তাদের বিচরণ ক্ষেত্রের পরিধি খুবই বড়ো।

কিন্তু প্রশ্ন হল মাটির মাধ্যমে শব্দ অনেক দূর যেতে

পারলেও সেই শব্দকে হাতিরা কীভাবে অনুধাবন করে? ওরেগন গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজির বিজ্ঞানী বেটস্ রাসমুসেন বলেছেন একাজে হাতিরা কাজে লাগায় তাদের শুঁড়কে। রাসমুসেন কিছুদিন ভারতে থেকেও হাতিদের ওপর গবেষণা করেছেন। বলা বাহুল্য, আফ্রিকা এবং এশিয়া মহাদেশে প্রধানত ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোথাও হাতির দেখা মেলে না। গন্ধ সম্পর্কে হাতিদের অনুভূতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও তীব্র। হাতিদের দেহ থেকে বিশেষ সময়ে ফেরোমোন নামে এক ধরনের গন্ধযুক্ত পদার্থ বেরুতে থাকে। সেই গন্ধকে আমরা অনুভব করতে পারি না। কিন্তু হাতিরা পারে। তাদের মুখগহ্বরের ওপরের দিকে অবস্থিত একটি বিশেষ অঙ্গের দৌলতেই তারা এ কাজ করতে পারে। মনে হল হাতির শুঁড়ের সূক্ষ্ম ডগায় কোনও রাসায়নিক গ্রাহক অণু আছে কী না, যেমন রয়েছে ফেরোমোন শনাক্ত করার জন্য। এর আগে হাতির শুঁড়ের ডগা নিয়ে তেমন গবেষণা হয়নি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোনও কোনও জায়গায় হাতির শুঁড়ের অগ্রভাগকে পবিত্র বলে মনে করা হত। লোকে এই অংশটি কেটে নিয়ে তাকে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে রক্ষা করত। সুতরাং কোনও হাতি মারা গেলে ওই অংশটি বিজ্ঞানীদের হাতে পৌঁছত না।

এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য রাসমুসেন টাসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রাইস মাঙ্গারের শরণাপন্ন হলেন। তিনি বানরের নাসাগ্র নিয়ে গবেষণা করেছেন। তখন তাঁর অবসর গ্রহণের সময় হয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও তিনি এ বিষয়ে গবেষণা শুরু করলেন। তিনি দেখলেন হাতির শুঁড়ের অগ্রভাগে সবচেয়ে সংবেদনশীল কলা বা টিস্যু রয়েছে। এত সংবেদনশীল টিস্যু তিনি আগে দেখেন নি।

কিন্তু এই টিস্যু রাসায়নিক সংকেত গ্রহণ করতে পারে না, এই টিস্যুর মধ্যে বিশেষ রকমের যে কোষ রয়েছে তাদের নাম 'ল্যাসিনিয়ান করপাসল'। এগুলি কম্পন ধরতে বা চিহ্নিত করতে পারে। এগুলি দেখতে অনেকটা পেঁয়াজের মতো। একটার পর একটা যোগকলার পর্দা দিয়ে গঠিত। পরপর দুটি পর্দার মধ্যে রয়েছে পাতলা জেলের (gel) মতো পদার্থ। কম্পন গ্রহণের ফলে পর্দাগুলির মধ্যে পারস্পরিক অবস্থানের বিচ্যুতি ঘটে। তার ফলে সৃষ্টি হয় স্নায়ুস্পন্দন। এই স্নায়ুস্পন্দন বা স্নায়ুসংকেত শেষমেশ পৌঁছে যায় মস্তিষ্কে। এই ধরনের করপাসল বা সূক্ষ্ম কোষ অন্যান্য স্তন্যপায়ীদেরও শরীরে রয়েছে। মানুষের আঙুলের ডগায় রয়েছে। কিন্তু হাতিদের শুঁড়ের ডগায় সেগুলি অনেক বেশি ঘন সন্নিবিষ্ট। এদের সাহায্যে হাতিরা কম কম্পাঙ্কের শব্দকে চিহ্নিত করতে পারে।

হাতি কখনও কখনও পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়। আবার কখনও পা ওপর দিকে তুলে ধরে। হাতির পায়ের পাতায় ও আঙুলে চর্বিযুক্ত নরম গদির মতো টিস্যু রয়েছে। সেজন্য হাতির চলার শব্দ পাওয়া যায় না। হাতির পা কিন্তু অত্যন্ত সংবেদনশীল। কোনও হাতি মারা গেলে অন্য হাতি তাকে পা দিয়ে একবার স্পর্শ করেই বুঝতে পারে সে মারা গিয়েছে কী না।

মাটির মাধ্যমে পাঠানো সংকেত বুঝতে এবং সংকেত পাঠাতে হাতিরা বিশেষ দক্ষ হলেও এভাবে তারা বিস্তারিত তথ্যের আদান-প্রদানে করতে পারে কী না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যদি একটি হাতিকে আরেকটি হাতি ডাকে তাহলে একটি হাতি অন্য হাতির অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়, বাতাসের মাধ্যমে সেই সংকেত শোনার সময় এবং মাটির মাধ্যমে সেই সংকেত শোনার সময় এবং মাটির মাধ্যমে সেই শব্দ শোনার সময়ের পার্থক্য থেকে। কোনদিক থেকে সংকেত আছে কোনও পায়ে সেই সংকেত প্রথম ধরা পড়ল তার থেকেও হাতিরা বুঝতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি আফ্রিকার হাতিদের তুলনায় এশিয়ার হাতিরা অনেক বেশি বুদ্ধি ধরে। অর্থাৎ এইসব ব্যাপারে এশিয়ার হাতিরা আফ্রিকার হাতিদের চেয়ে অনেক বেশি পটু।

কিন্তু মানুষের ক্রিয়াকলাপ হাতিদের দূরভাষ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে হাতিদের পাঠানো সংকেতের বিকৃতি ঘটাচ্ছে। কেমন করে? সে কথা বোধহয় তোমরাও জান।

আজকাল প্রকাশন-এর

খেলা

এখন পাক্ষিক অন্যরকম চেহারায়

দেশ-বিদেশের খেলাধুলোর খবর
তারকাদের রঙিন ব্লো-আপ।
আকর্ষণীয় ফিচার।
বিষয়-বৈচিত্র্যে অসাধারণ।

৮ টাকায় ৪৮ পাতা

বিধানি নিদান

নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক-অনগ্রসর গরিব দেশের এক বদ্যি পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর দেশের অসুস্থ রাষ্ট্রপ্রধানের ঘরে পৌঁছলেন। তিনি তাঁকে ঘিরে থাকা তাবড়-তাবড় শ্বেতকায় ডাক্তারদের সরিয়ে বদ্যিমশায়কে কাছে ডাকলেন। রাষ্ট্রপ্রধানকে দেখতে গিয়ে বদ্যিমশায় উপস্থিত ডাক্তারদের কাছ থেকে একটা ষ্টেথোস্কোপ চেয়ে নিয়ে তার বুক পরীক্ষা করেই ঘিরে থাকা চিকিৎসকদের দিকে তাকিয়ে বললেন— 'এই ষ্টেথোস্কোপটাই তো অকেজো-বিকল!' বদ্যিমশায় নিচু হয়ে কানটা রাষ্ট্রপ্রধানের বুকে ও পেটে চেপে ধরে খানিকক্ষণ বুকের ধুক-পুকুনি পরীক্ষা করলেন। ইতিমধ্যে একটা নতুন স্টেথোস্কোপও এসে পৌঁছল। তিনি আরও খানিকক্ষণ পরীক্ষার পর যন্ত্রণাকাতর রাষ্ট্রপ্রধানকে বললেন, 'আপনাকে কোনও জটিল বা নতুন ব্যমোয় ধরেনি। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মানে, ১৯৪৩ সালে একটি জার্মান যুদ্ধজাহাজকে টর্পেডো মেরে ফুটো করতে গিয়ে তাদেরই তোপে আপনাদের জলযানটি উল্টে যায়। তখন আপনি জলে ছিট্‌কে গিয়ে যানটির ঘুরন্ত প্রপেলারের ওপর পড়ে খুব ব্যথা পান? সেই ব্যথাটাই আবার চাগিয়ে উঠেছে! আপনার দরকার কয়েকটি যোগব্যায়ামের, দু একটা হালকা ওষুধও দিয়ে দিচ্ছি!'

এই ঘটনাটি আজ থেকে ৪৩ বছরেরও আগে আমেরিকায় ঘটেছিল। ৭৯ বছর বয়সের এই বদ্যিটি হলেন পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির পথপ্রদর্শক রূপকার শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়।

উনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলালের বিশেষ অনুরোধে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জন ফিট্‌জেরাল্ড কেনেডির সঙ্গে দেখা করতে ১৯৬১ সালের ৫ অগাস্ট ওয়াশিংটনে পৌঁছন। তাঁর চিকিৎসার খ্যাতি আগেই কেনেডির কানে পৌঁছেছিল, তাঁদের সাক্ষাৎকারের দিন ঠিক হয়েছিল ৭ অগাস্ট। কিন্তু ৪৪ বছর বয়সের যুবক কেনেডি ইতিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি বিধানচন্দ্রের আসার সংবাদ পেয়ে তাঁকে ৫ অগাস্টেই সাদরে নিয়ে আসার জন্যে তৎক্ষণাৎ লোক পাঠালেন। তারপরের ঘটনা তো আগেই বলেছি। বিধানচন্দ্রের চিকিৎসাজীবনের এমনি আরও অজস্র ঘটনা আজ আমাদের কাছে গল্পের মতো হয়ে গেছে।

তাঁর চিকিৎসায় নেতাজি, গান্ধিজি, রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, স্যার আশুতোষ, ড. শ্যামাপ্রসাদ, মতিলাল নেহেরু, জওহরলাল, শরৎ বোস কে না সুস্থ হয়েছেন? এছাড়াও তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেল ও দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট জেলের কয়েদিদেরও চিকিৎসা করতেন।

২৪ জুন ১৯৬২-র সকালে শেষবারের জন্য তিনি ২৯ জন রোগী দেখেন। ওইদিন বিকেলে মহাকরণে কর্মব্যস্ততার মধ্যেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যোগেশ ব্যানার্জি ও ডাক্তার শৈলেন সেনের ডাক পড়ে, তাঁরা কোনও ভয়ের কারণ খুঁজে পান না। কিন্তু বিধানচন্দ্র তাঁর ৫০ বছরের অভিজ্ঞতায় অন্য ইঙ্গিত পেলেন। তখন তিনি তাঁর চির প্রতিদ্বন্দ্বী দিক্‌পাল ডাক্তার গোষ্ঠ সিংহকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে বললেন, 'গোষ্ঠ তুমি তো আমায় জীবনে কখনও 'কেয়ার' করনি? সত্যি কথাটা বল দিকিনি? যোগেশ আর শৈলেন ভয়ে কিছু বলতে চাইছে না!'

গোষ্ঠডাক্তার বিধানচন্দ্রকে পরীক্ষা করে বললেন, 'যে কোন সময় একটা হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি, এটা চরম মারাত্মক হতে পারে।'

ডাক্তার গোষ্ঠ সিংহ ২৪ জুন সত্যি কথাটাই বলেছিলেন। এক সপ্তাহ বাদে তাঁর ৮০তম জন্মদিনের দিন ১লা জুলাই ১৯৬২ সালে ডা. বিধানচন্দ্র রায় ইহলোক ত্যাগ করেন।

ছবি : সত্যজিৎ রায়

ছবিটি ১৯৬২ সালের 'সন্দেশ'-এর পাতা থেকে নেওয়া

নন্দ গুপীর নন্দ কপাল

দিলীপ দাস

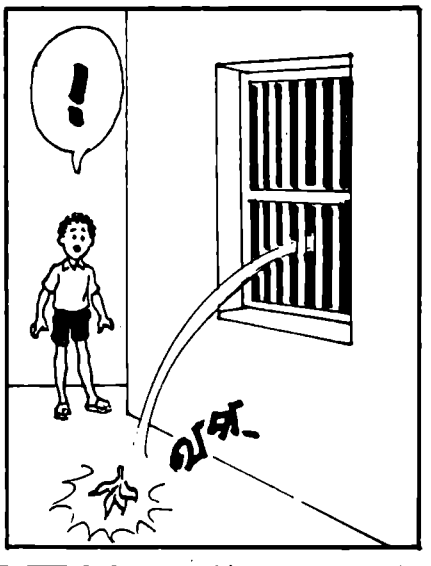

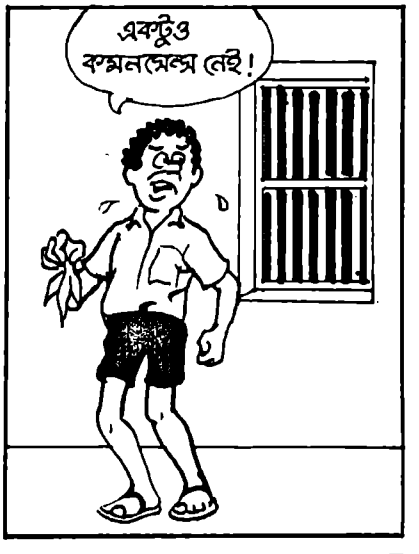

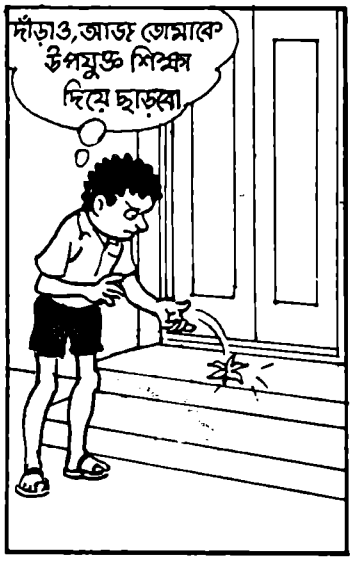

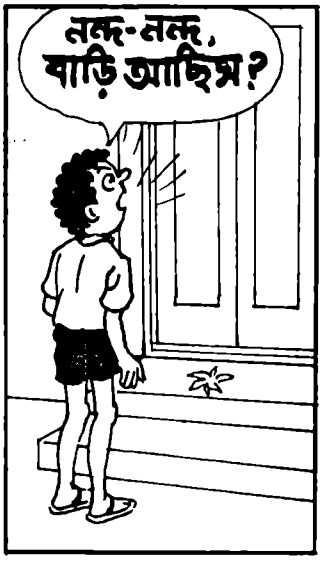

ইয়া:!
?
আমি জানতে চাই কে এখানে এভাবে কলার খোসাটা ফেলেছে?
আরে গুপী! আরে, ভোলোদার কী হলো?
ইয়াহা:!
ওরে বাবারে!
উপস্!
এটা কী হলো?
আ-আমি ইচ্ছে করে পড়িনি ভোলোদা! ও-ওই কলার—
তা তো বুঝলাম, কিন্তু এগুলো এখানে এলো কী করে?
আমিও তো তাই ভাবছি!
আমি জানি। কে একটু আগে দু-দুটো কলা দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরেছে?
আজ আর ছেড়ে কথা কইবুনি!
আশা করি এবার গুপীর একটু আক্কেল হবে।
ওরে বা-বা-রে!

ইউরো কাপ, অঁরি দেলানি এবং অঘটন!

সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়

কোপা আমেরিকা বা এশিয়ান কাপের সঙ্গে ইউরো কাপের বিস্তর অমিল। আদতে অন্য দুটোর মতো ইউরো কাপও মহাদেশীয় টুর্নামেন্ট আর সেই চারবছর অন্তরই হয়— মিল বলতে টেনেটুনে এটুকুই, নয়তো ইউরোপ সেরা হওয়ার টুর্নামেন্টের ইতিহাসে এক ঝলক চোখ বোলালেই বোঝা যাবে কোপা বা এশিয়ান কাপের তুলনায় কতটা ফারাক। বয়সের নিরিখে যেমন ইউরো কাপ অন্তত কোপা আমেরিকার তুলনায় নেহাতই শিশু! ফেলে আসা শতকের কুড়ির দশকে জন্ম হয়েছিল কোপার। সত্যি কথা বলতে টুর্নামেন্টটি বিশ্বকাপের চেয়েও পুরোনো। লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যে কারা ফুটবলে সেরা সেটাই নির্ধারণ করে দেয় কোপা আমেরিকা। তারপরও আছে গ্ল্যামার আর গোটা ফুটবলবিশ্বে সার্বজনীন আবেদনের প্রসঙ্গ। এবং এ ব্যাপারে তো ইউরো কাপ এক বিশ্বকাপ ছাড়া এই গ্রহের অন্য যাবতীয় টুর্নামেন্টকেই পাঁচ গোল মেরে বসে আছে! ইউরো'র পাশে কোথায় লাগে কোপা বা আমাদের এই মহাদেশের এশিয়ান কাপ। আরও একটা অমিল— টুর্নামেন্টের নাম বদলের ব্যাপারে। ইউরো কাপের ইতিহাস ঘাঁটলেই বোঝা যাবে, বারবারই বদলে গিয়েছে টুর্নামেন্টের পোষাকি নাম। ১৯৬০-এ শুরুর বছরে এখনকার মতো ইউরো কাপ নয়, নাম ছিল ইউরোপিয়ান নেশনস কাপ। সেবার ফ্রান্সে বসেছিল প্রতিযোগিতার আসর। চারবছর পরে টুর্নামেন্ট চলে গেল স্পেনে তবে নাম বদলাল না। নাম বদল ফের ১৯৬৮ সালে। ইতালিতে অনুষ্ঠিত সেবারের টুর্নামেন্টের 'অফিসিয়াল' নাম হল ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ। অনেক পরে ১৯৮৮ সালে এসে ইউরো কাপ হল! এবার লুইস ফিগোর দেশে ইউরো-২০০৪, হিসেব কষলে বোঝাই যাচ্ছে টুর্নামেন্টের দ্বাদশ সংস্করণ এটা। আগের এগারোটি আসরে এমন অনেক কিছু ঘটে গিয়েছে যা সার্বিকভাবে বিশ্ব ফুটবলকেই সমৃদ্ধ করেছে।

একদম গোড়ার কথা বললে প্রথমেই আসে ইউরো কাপের রূপকারের নাম। অঁরি দেলানি। তৎকালীন ফরাসি ফুটবল সংস্থার কর্ণধার এই সুদর্শন মানুষটিই একজোট করেছিলেন ইউরোপের অন্য দেশগুলোর ফুটবল কর্তাদের এবং দেলানিই ওঁদের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এক মহাদেশীয় টুর্নামেন্ট চালু করার। প্রথমটায় দেলানি নিজেও নিঃসংশয় ছিলেন না যে তাঁর এই প্রস্তাবে আদৌ সাড়া দেবেন কী না অন্য ফুটবল কর্তারা। কিন্তু তাঁর আশঙ্কা যে পুরোপুরিই অমূলক ছিল বোঝা গেল প্যারিসের সেই ঐতিহাসিক সভায়। সকলে একমত হলেন যে, অবিলম্বেই চালু করে দেওয়া উচিত ইউরোপীয় মহাদেশের সেরা ফুটবল খেলিয়ে দেশগুলোর এই প্রতিযোগিতা। যেমন ভাবা তেমনই কাজ। ১৯৬০ সালেই বসল ইউরোপিয়ান নেশনস কাপের আসর। তবে টুর্নামেন্ট শুরু আগেই ভয়াবহ ট্রাজেডি! ইউরো কাপ চালু করার ভাবনা যাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত সেই অঁরি দেলানির দেশেই মানে ফ্রান্সেই টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী আসর। সংগঠন কমিটির প্রধান শশব্যস্ত দেলানি হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন আর তারপর ...। ওঁর 'স্বপ্নে'র বাস্তবায়িত রূপ দেখেই যেতে পারলেন না ফুটবল পাগল প্রৌঢ় ফরাসি। আর টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই এমন একটি বিষাদের ছবি মনমরা করে তুলল সকলকেই। তবে দেলানিকে ইউরো কাপের মধ্যে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখতে তৎপর ওঁর উত্তরসূরিরা ঠিক করলেন টুর্নামেন্টের বিজয়ীকে যে ট্রফি দেওয়া হবে তা হবে অঁরি দেলানিরই নামাঙ্কিত। সেই ট্র্যাডিশন আজও অব্যাহত। এবারও ৪ জুলাই লিসবনে যাঁর হাতেই উঠুক না কেন কাপ, ট্রফির গায়ে অমলিন অঁরি দেলানির নাম চোখ টানতে বাধ্য।

আসলে সমস্ত ক্রীড়া মহাযজ্ঞের রূপকার হিসেবেই কোনও একজনের নাম জনমানসে ভাস্বর হয়ে থাকে। আধুনিক ওলিম্পিকের প্রবর্তক হিসেবে যেমন ইতিহাসে ঢুকে গিয়েছেন ব্যারন পিয়ের দ্যঁ কুবার্তো। আবার বিশ্বকাপ ফুটবলের জনক হিসেবে জুলে রিমের নাম অধুনা লোকগাথায় পরিণত। ঠিক তেমনই অঁরি দেলানিও থাকবেন শুধু ইউরোপ নয়, গোটা বিশ্বের আপামর ফুটবল অনুরক্তের মানসপটে চির উজ্জ্বল হয়েই।

তবে শুরুর বছরে টুর্নামেন্টের 'ফরম্যাট' এখনকার মতো ছিল না। এবার যেমন পোর্তুগালে ষোলোটা দেশ

খেলছে এবং যাঁদের সবাইকেই টুর্নামেন্টের মূলপর্বে আসতে হয়েছে কোয়ালিফাইং রাউন্ডে লড়াই করে। আর এজন্যই 'অঘটন'। এর যাঁতাকলে পড়ে রোমানিয়া, হাঙ্গেরি বা আয়ারল্যান্ডের মতো ইউরোপের ঐতিহ্যশালী ফুটবল শক্তিধর দেশগুলো আগেই ছিটকে গিয়েছে। টুর্নামেন্টের প্রথম পাঁচটা আসরে কিন্তু এসবের বালাই ছিল না। অংশগ্রহণকারী দলও ছিল অনেক কম, মাত্র আট। দলগুলোকে চারটে পর্যায়ে ভাগ করে 'হোম' অ্যান্ড 'অ্যাওয়ে' প্রথায় খেলিয়ে চার সেমিফানালিস্ট বাছা হত। ইউরো কাপের ষষ্ঠ আসর থেকে (১৯৮০, ইতালি) 'ফরম্যাট' বদলে যায়। আটটি দলকে দুটো গ্রুপে ভাগ করে রাউন্ড রবিন প্রথার সেবারেই শুরু। আর এখনকার মতো ষোলো দেশের টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে মাত্রই ১৯৯৬-র ইংল্যান্ড ইউরো কাপ থেকে।

১৯৬০-এর প্রথম আসরে 'ফেভারিট' ছিলেন জঁ ফঁতে-রা। বিশ্ব ফুটবলের এক স্মরণীয় চরিত্র এই ফরাসি সুপার স্ট্রাইকার। ১৯৫৮-র সুইডেন বিশ্বকাপের এক আসরে তেরো গোল করে তাত্ত্বিকদের চোখ কপালে তুলে দিয়েছিলেন ফঁতে। স্বভাবতই ঘরের মাঠে ইউরো কাপের উদ্বোধনী আসর যে 'তিনি'ই মাতাবেন এমন একটা সম্ভাবনাকে যথেষ্ট প্রশ্রয়ই দিচ্ছিলেন ফ্রান্সের গড়পড়তা সাধারণ। কিন্তু ফুটবল যুগে যুগে তাবড় তাবড় অনেক পণ্ডিতকেই তো বোকা বানিয়েছে! চ্যাম্পিয়ন হওয়া দুরের কথা, ইউরো কাপের প্রথম আসরের ফাইনালেই উঠতে পারল না আয়োজক দেশ। প্যারিসের ফাইনালে খেলল সোভিয়েত ইউনিয়ন আর চেকোশ্লোভাকিয়া। আর আইফেল টাওয়ারের শহরে শেষ হাসি রুশদেরই ২-১ গোলে বিপক্ষকে হারিয়ে। আসলে বিশ্বকাপের সঙ্গে এই একটা ব্যাপারে ইউরো কাপের খুব মিল। টুর্নামেন্টের প্রায় প্রতিটি আসরেই চোখে পড়ার মতো অঘটন। ১৯৭২-এর আসরে যেমন প্রায় 'এলেবেলে' বেলজিয়াম সেমিফাইনালে হারিয়ে দিল 'গোলিয়াথ' ইতালিকে। ব্রাসেলসে ম্যাচ শুরুর আগে কেউ ভাবেইনি 'আজুরি'রা হারবে। অথচ শেষমেশ সেটাই ঘটালেন বেলজিয়ানরা (২-১)। ফাইনালে উঠেও পশ্চিম জার্মানির কাছে হেরে ট্রফি জিততে না পারলেও সেই ম্যাচ চিরকালের জন্য ইউরো কাপের 'হল অব ফেম'-এ ঢুকে গিয়েছে। যেমন, ১৯৯২-এ ডেনমার্কের ইউরোপ সেরা হওয়ার ঘটনা। কোয়ালিফাইং রাউন্ডের বাধাই সেবার পেরোতে পারেনি এই স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশটি। তাদের গ্রুপ থেকে সুইডেনের মূলপর্বে গিয়েছিল যুগোশ্লাভিয়া। অথচ, দেশের মধ্যে ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ আর সার্বিয়া নিয়ে গোটা দুনিয়ার রাজনৈতিক মহলে নিন্দিত যুগোশ্লাভিয়াকে ইউরো কাপ থেকে 'বহিষ্কার' করে উয়েফা। ফলে মূলপর্বে খেলার সুযোগ পেয়ে যায় ডেনমার্ক। আর এই 'পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা'র পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে শেষমেশ ট্রফিই জিতে নেন মাইকেল লড্রুপ, পিটার স্মাইখেলের মতো সুপারস্টারে সমৃদ্ধ ডেনমার্ক। সেমিফাইনালে রুড খুলিটের নেদারল্যান্ডস আর ফাইনালে ক্লিনসম্যান, লোথার ম্যাথাউজের জার্মানিকে হারিয়ে!

এবার পোর্তুগালেও যে এমন 'অঘটন' ঘটবে না, তাই বা কে বলতে পারে? অবশ্য লেখাটা যখন হাতে পাবে, তখন অনেক কিছুই 'ঘটে' গেছে।

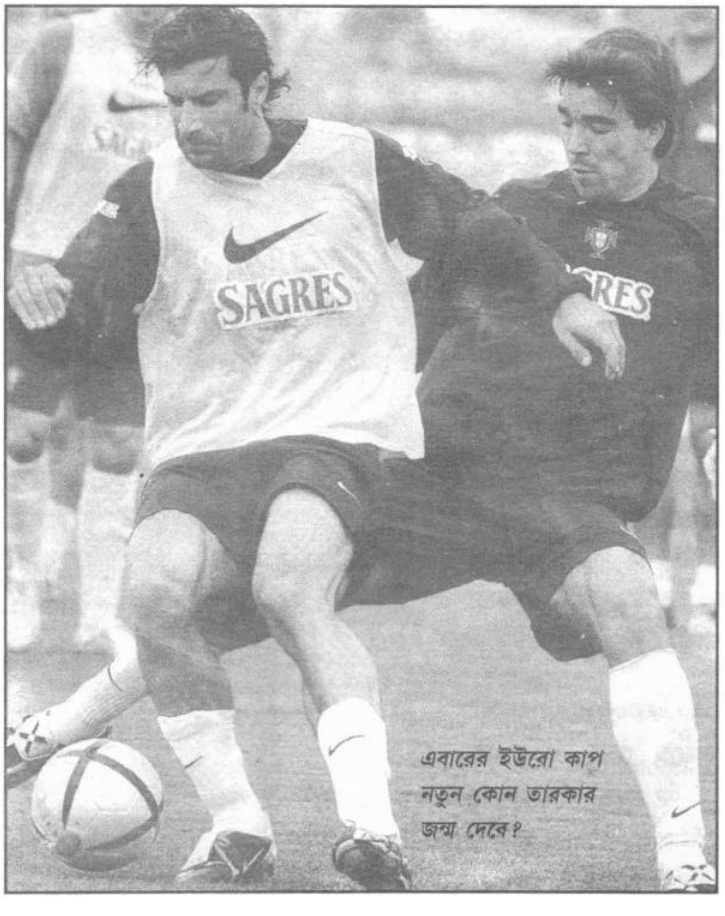

এবারের ইউরো কাপ নতুন কোন তারকার জন্ম দেবে?

এভারেস্ট, বাঙালি এবং সত্যব্রত

বল বয়

দুধের স্বাদ মেটাতে আর ঘোলের প্রয়োজন নেই। আমাদের আর এই শুনে সান্ত্বনা পেতে হবে না যে বাঙালিদের মধ্যে অমুক এভারেস্ট শীর্ষের সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। আর কাছাকাছি নয়, সত্যি সত্যিই শীর্ষে পৌঁছে গেছেন এক বাঙালি যুবক। ভারতীয় নৌসেনা বিভাগের কমাণ্ডার ৩৯ বছর বয়সি সত্যব্রত দাঁম গত ১৯ মে দুপুর এগারোটা চল্লিশ মিনিটে বাঙালির গর্ব ছড়িয়ে দিলেন পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিন্দুতে। এভারেস্টের সঙ্গে জড়িয়ে গেল দ্বিতীয় বাঙালির নাম। প্রথম নাম অবশ্যই রাধানাথ শিকদারের। এভারেস্টের উচ্চতা নির্ণয়ের দলগত প্রচেষ্টায় রাধানাথ শিকদার ছিলেন অন্যতম।

নেপালের অধিবাসীরা বলেন 'সাগরমাথা', তিব্বতে 'চোমোলোংমা' আর সারা পৃথিবীর কাছে এভারেস্ট— পৃথিবীর এই সর্বোচ্চ শৃঙ্গটিতে আরোহনের স্বপ্ন দেখেন সব পর্বতারোহীরাই। মৃত্যু ওঁত পেতে রয়েছে এভারেস্টের আনাচে কানাচে, কিন্তু তাও পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকেই ওঁরা ছুটে আসেন এখানে। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের জবাবে কিংবদন্তি পর্বতারোহী জর্জ লে ম্যালোরি করেছিলেন একটা অসাধারণ উক্তি, 'Because it's there.'

১৯২১ থেকে একের পর এক অভিযান হয়েছে। ১৯৫৩-র ২৯ মে প্রথমবার এভারেস্ট সামিটে মানুষের পদচিহ্ন পড়ল। সেই শুরু। তারপর একের পর এক অভিযাত্রী এভারেস্ট শীর্ষে আরোহন করেছেন। অনেকে একবার, কেউ দুবার, তিনবার এমনকি কেউ চোদ্দবারও পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন। সফলদের তালিকায় শেরপাদের আধিক্য থাকলেও ভারতের অন্যরাজ্যের অভিযাত্রীদের নামও এক এক করে যোগ হচ্ছিল। কিন্তু বাঙালি? এভারেস্টে ভারতীয় অভিযাত্রীদের প্রথম দুটি অভিযানে ছিলেন প্রথম এবং একমাত্র বাঙালি অজিতকুমার চৌধুরী। এই দুটি অভিযানই শীর্ষে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯৬৫ তে এম. এস. কোহলির নেতৃত্বে প্রথম ভারতীয় অভিযান শীর্ষে পৌঁছতে সক্ষম হয়। দলে ছিলেন এ. কে চক্রবর্তী। ওই দলের ন'জন শীর্ষে পৌঁছলেও শ্রী চক্রবর্তীর কাছে সামিট অধরাই থেকে গেছিল। ১৯৯১ সালে ভোরুকা মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউট এর দলটি ছিল বাংলার দল। দলনেতা ছিলেন প্রাণেশ চক্রবর্তী। এছাড়াও ছিলেন অপূর্ব ভট্টাচার্য সহ অনেক বাঙালি পর্বতারোহী। ১৯৯৩ সালে অমূল্য সেনের নেতৃত্বে আরও একটি বাঙালি দল নর্থ কল দিয়ে এভারেস্ট শীর্ষে আরোহনের চেষ্টা করে। ১৯৯৫ এ ওই একই পথ দিয়ে আরেকটি বাঙালি অভিযান হয়। এই দলে অতনু চট্টোপাধ্যায় শীর্ষের অনেকটাই কাছে পৌঁছেছিলেন। মোটামুটি এই হল এভারেস্টে বাঙালির আরোহনের প্রচেষ্টা।

অবশেষে সফল হলেন সত্যব্রত দাম। অনেকদিন আগে একটি ছোট্ট মেয়ে শুশুনিয়া ও অযোধ্যা পাহাড়ে চড়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল এভারেস্টের। মেয়েটির স্বপ্ন সফল হয়নি। কিন্তু মেয়েটি তা স্বপ্ন ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল তার ছেলের মধ্যে। সবিতা দেবীর ছেলে সত্যব্রতর বারো বছর বয়স থেকেই পাহাড় চড়ায় হাতেখড়ি। দেরাদুন অঞ্চলের পাহাড়ে আরোহন শুরু। এর পর একের পর এক শৃঙ্গ বিজয়। আল্পসের বেশ কিছু শৃঙ্গ, কানাডার রকি, অস্ট্রেলিয়ার ব্লু মাউন্টেন, নিউজিল্যান্ডের সাদার্ন আল্পস, সাউথ আফ্রিকার ওয়েস্টার্ন এবং হিমালয়ের বিভিন্ন শৃঙ্গ। একের পর এক পাহাড় টপকে সত্যব্রতর সাম্প্রতিক অভিযান— পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিন্দু। এবং এবারেও সফল সত্যব্রত।

ভারতীয় নৌবাহিনীর সাবমেরিনার কমাণ্ডার সত্যব্রত দাম পাহাড় চড়তে যেমন ভালোবাসেন, তেমনই ভালোবাসেন ছবি তুলতে এবং লিখতে। ব্যাডমিন্টন এবং ক্রিকেট ও রয়েছে তাঁর পছন্দের তালিকায়।

হারিয়ে গেছে নাকি!

জীবন সর্দার

কোথায় ওরা হারিয়ে গেল? রূপকথার বইয়ে যে সব পশুপাখির গল্প পড়েছিলাম পক্ষীরাজ ঘোড়া, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি পাখিরা, রামায়ণের জটায়ু পাখি, কিংবা হিতোপদেশ গল্পের ওরা,— যারা মানুষ না হয়েও মানুষের ভাষায় কথা বলতো কোথায় তারা হারিয়ে গেল! এখন বুঝি রূপকথার পাতাতেই তাদের কথা শেষ। তখন ছোটোবেলায় আমার মনে হত, কোথাও না কোথাও, তেমন পশুপাখি আছেই। কিন্তু কোথায়। কেউ বলতে পারত না। আমিও নাছোড়বান্দা। একা একাই খুঁজতে যেতাম বনের পশুপাখি। জলের মাছ। পথের গাছ। একথা সত্যি, আমি যাদের খুঁজতাম তাদের দেখা পেতাম না ঠিকই; কিন্তু দেখে দেখে চিনতে শিখতাম অনেক কিছু।

ডলফিন

আমার আজকের কথা তাদের নিয়েই। এই দেশেই, যে দেশে জন্মেছি সেখানেই, প্রকৃতি-পড়ুয়াদের নিয়ে গিয়ে চিনিয়ে দেবার কয়েক বছর পর ফের গিয়ে দেখি— তারা কেউ কেউ সেখানে আছে, অনেকেই নেই। মনে খুব কষ্ট হয় তখন।

যেমন ধর, গঙ্গার শুশুকের কথা। রূপনারায়ণ-গঙ্গার মোহনায় নৌকোয় বসে প্রকৃতি-পড়ুয়ারা শরৎ কালে শুশুক গুনত। সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটের মধ্যে চারদিকে চারজন মুখ করে বসে কটা শুশুক দেখতে পেল তার হিসেব রাখত।

জলের তলায় অদৃশ্য শুশুককে বারবার দেখা যেতে পারে, কিন্তু একই সঙ্গে চারদিকে মুখ করে চারজন প্রকৃতি-পড়ুয়া চারটিকেই দেখবে। এমন ঘটনা ঘটেছিল ছয়বার— মানে, ছ'ঘণ্টায় চব্বিশটা শুশুকের দেখা পেয়েছিলাম

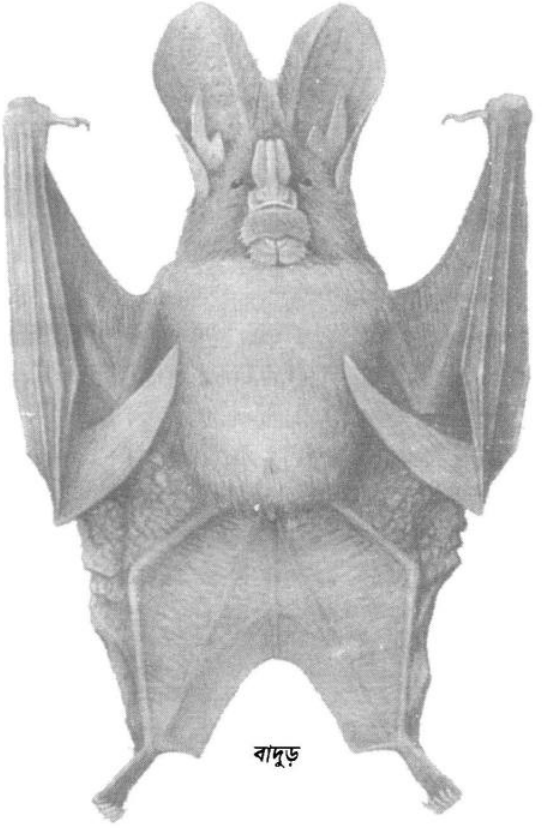
বাদুড়

একজায়গায়। এটা ছিল এক ধরনের খেলা আর এখন সারাদিনে একজন একটাও দেখতে পাবে কী না সন্দেহ। কোথায় গেল শুশুকেরা! বছরের ওই সময় অনেক গাংচিল নদীর জল ভেসে থাকত। তাদেরই দেখিনা।

আজ কোনও পাখির কথা নয়। আমাদের মতো স্তন্যপায়ীদের কথা। জলের স্তন্যপায়ীর কথা বলার পরই আকাশে ভাসা স্তন্যপায়ী-বাদুড়ের কথা বলে নিই।

দক্ষিণ ভারতে পাখি দেখতে গিয়ে একবার সেলিম আলি একধরনের বাদুড়ের দেখা পেয়েছিলেন— খয়েরির সঙ্গে ছাই রঙ মেশানো তার লোম। লেজ ছিল না ওটার।

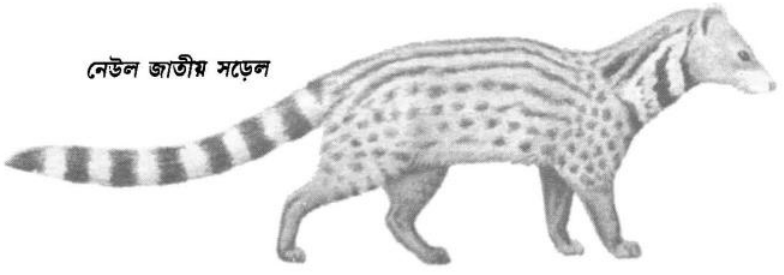

নেউল জাতীয় সড়েল

উনি কোডাইকানাল- মাদুরাই পাহাড়ে অমন ধরনের বাদুড় আবিষ্কার করেছিলেন বলে, ওটার নাম দেওয়া হয়েছিল 'ফলখেকো সেলিম আলির বাদুড়'। ওই অঞ্চলে গিয়ে একবারও অমন বাদুড়ের দেখা পাইনি। সে তবে কোথায় গেল!

তবে বাদুড় নয় একধরনের বানর দেখেছিলাম পশ্চিম ঘাট পর্বতে। গোয়া দখলের যুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে। লোন্ডা নামে বনের ভেতর এক রেল স্টেশনে থাকতে হয়েছিল একটা পুরোদিন। সাহস করে কাছাকাছি বনের ভেতর ঢুকে, গাছের উপর কচি শিশুর মতো কান্না শুনে তাকিয়ে দেখি ওমা, এযে সিংহ-বানর। ঘাড়ে ফোলানো সাদা কেশর, লেজের ডগায় এক গোছা লোম। যেমন সিংহদের হয়। কিন্তু গাছে বসে আমাকে যখন ভয় দেখাল, সেটা নিছক বাদরামি। এখন ওই বনে চা-কফির বাগান হয়েছে। নতুন রেলপথ হয়েছে। গাড়ি চলাচলের পাকা পথ হয়েছে। কিন্তু বান্দারুরা কোথায় গেল। স্থানীয় ভাষায় ওদের বান্দারু বলে। শুনেছি কেরলের বনে ভবানী নদীর তীরে কয়েকটা বান্দারুর দল চড়ে বেড়ায়। কিন্তু গ্রামের কাছের বন থেকে তারা নিরুদ্দেশ।

ওই অঞ্চলের গভীর বনে আর এক ধরনের বানর রয়েছে। লেজহীন রাতচরা। কলকাতা চিড়িয়াখানায় দেখেছিলাম একটিকে, লজ্জাবতী বানর নামে পরিচিত ছিল সে। খাঁচায় দেখেছি তাকে, বনে দেখিনি। গল্প শুনেছি ওদের তেল দিয়ে বদ্যিরা চোখের তেজ বাড়াবার ওষুধ তৈরি করেন। তবে আর কী, গভীর ঘন বনে যদিওবা দু'একটি লজ্জাবতী বানরের দেখা মিলতেও পারে, কিন্তু তার বাইরে?

বাইরে দূরে ঘুরে এখন আর শজারু, ভোঁদড়, বনরুই বা বজ্রকীট, গন্ধগোকুল, নেউল, আর মেছোবিড়ালদের দেখতে পাই না। আমার ছোটবেলার গ্রামের নির্জন পোড়ো জমিতে বছরের কোনও এক সময়ে ওদের দেখতে পেতাম। ছোটো হলেও কী সুন্দর ছিল ওরা দেখতে বলো!

কড়গড়ি নামে এক জাতের কুকুরের কথা শুনেছি। দেখিনি। ওড়িশার কালাহান্ডি জঙ্গলের বাসিন্দা নাকি। তবে ধোল বা লালকুত্তা যাকে বলে, তেমন এক ধরনের বুনো কুকুরকে দূর থেকে দেখেছি। দল বেঁধে ছুটছিল। রাতের বেলায় গ্রামের কাছে চলে আসে, গ্রামের ছাগল-বাছুর নিয়ে যায়। তাই গ্রামের লোকের পছন্দ নয় তাদের। পিঠের দিকের লোম লালচে, পেটের দিকের লোম কম লাল। মোটা লেজটি কালচে। মনে হয় শেয়াল দলের কেউ। অবশ্য কুকুর তো শেয়াল দলেরই বা উলটো সত্যি। যে দলেরই হোক আমার কাছে সবাই প্রিয়। এখন সারারাত বসে থেকেও ওদের দেখা মেলে না।

পশুপাখি প্রিয় হলে অনেক কষ্ট পেতে হয়। কষ্ট পাচ্ছিও। কেন ওরা 'হারিয়ে' যায়, নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, ভেবে কষ্ট হয়। একটা কারণ তো মানুষের শিকার শিকার খেলা। তাতে যে কত প্রাণীর প্রাণ গেছে হিসেব কে করে। শিকারের মতো নিষ্ঠুর খেলায় না হলেও চাষ-আবাদের জন্যে, নিজেদের প্রিয় জায়গা, বনের আড়াল হারিয়ে অনেক পশুপাখি নিরুদ্দেশের পথিক হয়েছে। আশ্রয় নেই, খাবার নেই কতদিন আর মানুষের ইচ্ছার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকবে? শুশুকের কথা বলেছি— গিয়ে দেখ, আধুনিক জলযানের প্রপেলারের আঘাতে জলের প্রাণীদের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে ভেসে উঠছে। সত্যি বলছি মানুষের অসৎ ইচ্ছেটাই প্রাণীকুলের বেচেবর্তে থাকার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

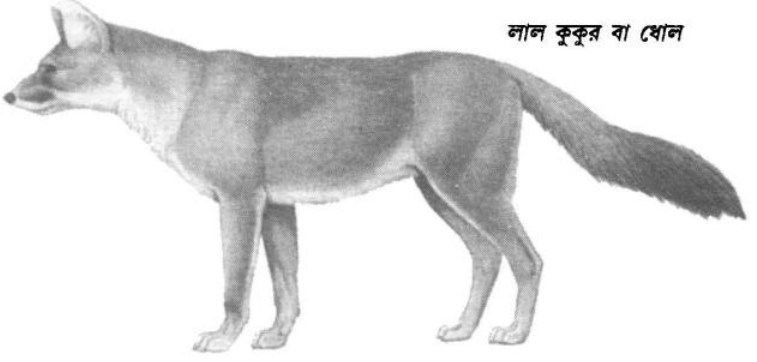

লাল কুকুর বা ধোল

প্রত্যেক মাসের প্রথম রবিবার বিকেলে বসে প্রকৃতি পড়ুয়ার পাঠশালা। কার্যালয়ে যোগাযোগ কর।

বিয়েবাড়ি

শঙ্খশুভ্র মল্লিক

গ্রাহক সংখ্যা : ৩৭৯১, বয়স : ১২

আচ্ছা বিয়ে বাড়ি মানে কী? হইচই, ভালো জামাকাপড় পরা এবং অবশ্যই মুখ্য কর্ম হিসেবে খাওয়াদাওয়া, সোজা কথায় বিয়েবাড়ি ইজ ইকুয়ালটু আনন্দ।

কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝি না বিয়েবাড়ির এত উপকারিতা সত্ত্বেও বিয়ের কার্ডটা হাতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে বাবা-মা'র মুখটা কেন বদলে যায়? তখনকার মতো দুপক্ষেরই কাষ্ঠ হাসি বিনিময়। তারপর যেই না প্রদানকারীর চোখের আড়াল হওয়া অমনি বাবা দুঃসংবাদ শোনার মতো কার্ডটা হাতে নিয়ে মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়ে। তারপর আরম্ভ হয় দরকষাকষি। মা যত চড়ায় বাবা তত নামায়। বিষয়টা উপহার সংক্রান্ত। তা কিছুক্ষণ এরকম হবার পর বাবা ক্লান্ত হয়ে 'তুমি যা ভালো বোঝ কর', বলে মায়ের উপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে খাটের উপর শুয়ে পড়ে। মাও জানে শেষমেশ যত দায় তার ঘাড়েই। যদিও শেষকালে উপহারটা দুজনে মিলেই কেনে।

এতো গেল প্রস্তুতির কথা। তারপর বিয়ের দিন সকালবেলা থেকে আরম্ভ হয় যুদ্ধকালীন তৎপরতা। এবারের উপলক্ষ্য জামা কাপড়, আমারটা প্রায়শই ঠিক করা থাকে। আর না থাকলেও আমি চাইলেই মা বের করে দেয়, বাবা তো লুঙ্গি পরে যেতেও রাজি। সমস্যাটা মাকে নিয়েই। বলতে নেই মার অনেক শাড়ি। কিন্তু পরার বেলায় 'ওটা পরশু কাচিয়েছি ষাট টাকা দিয়ে' কিংবা 'বেনারসি! এই গরমে!' 'উঁহুঁ ওটা হালকা বটে কিন্তু রংটা বড়ো জ্যালজ্যালে'— ইত্যাদি নানা টুকরো বিশ্লেষণ। আবার কিছুক্ষণ আলমারি উপর-করা শাড়ির মাঝে দুজনের যুগ্ম গবেষণা চলার পর শেষঅব্দি একটি দু'তিনবার পরা শাড়িকেই মনোনীত করা হয়।

তা শাড়ির অধ্যায়ে ইতি টানলেও বাকি আছে গয়নাপরা। সোনার গয়না নিষিদ্ধ কারণ চোর, ডাকাতরা নাকি গয়না নেবার জন্য সদরের বাইরে বসে আছে। অগত্যা ইমিটেশন। তাকে বার করতে বিশেষ সমস্যা না হলেও তিনি কৃপাবশত তার দেহের প্রতি খাঁজে সালফারের মনোরম সবুজাংশের সৃষ্টি করেছেন। অগত্যা বাবা তাকে লুঙ্গির খুঁট দিয়ে মুছতে লেগে যায়।

এরকম নানা গোলযোগের অন্তে মোদের 'যাত্রা হল শুরু'। রাস্তায় বেরিয়েও গোল। বাবা ছোটে বাস ধরতে। আর আমরা দুজনে দৌড়োই ট্যাক্সির পিছনে। কিন্তু আমরা দলে ভারী, অগত্যা বাবার মুখ ব্যাজার হলেও ট্যাক্সিই নিতে হয়।

এরপর বিয়েবাড়িতে ঢোকার মুখেই কনেকর্তার সঙ্গে দেখা। সঙ্গে সঙ্গে বিক্রিয়া, উভয়েই হাসিতে ফেটে পড়ল। তারপর যেই না পেছনে ফেরা অমনি ভোজবাজির মতো উভয়েরই হাসি উবে গেল। তা যাকগে । তাতে আমার মাথাব্যাথার কারণ নেই। আমি ভেতরে নিশ্চিন্তে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছি। আমার পাশে কনেকর্তা। এমন সময় এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে কনেকর্তার পাশে বসে পড়ে ফিসফিস করে কী যেন বলতে গেলেন। আমি আবার ফিসফিসানির প্রতি চিরকালই একটু আগ্রহপ্রবণ। তা এবারেও তার ব্যতিক্রম হল না। শুনলাম

ভদ্রলোক বললেন 'ওরে রসগোল্লা শেষ'। কনেকর্তার মাথায় হাত 'সে কীরে এই তো সাত হাঁড়ি আনলাম'।

'আমি কী করব' 'ভদ্রলোক রেগে মেগে বললেন, 'পাঁচুকে বললাম একটু টেনে দে। তা কে শোনে কার কথা, সে একেবারে কনুই ডুবিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এখনও বরযাত্রীদেরই খাওয়া হয়নি'!

এমন সময় শুনি পাশের চেয়ারে আবার ফিসফিস 'ওরে লুচি দিচ্ছে' ভদ্রলোক সচকিত হলেন। কিছুক্ষণ কেটে গেল, আবার দূতের প্রবেশ 'ওরে মাংস' ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে পরিবার নিয়ে ছুট লাগালেন। আমরাও তাদের অনুসরণ করতে দেরি করলাম না, কিন্তু ততক্ষণে সিঁড়ি মুখে ট্রাফিক জ্যাম। আবার ফিসফিসানি 'ওরে রসগোল্লা'। ব্যাস যে যেখানে ছিল দিল দৌড়, আর মাঝখান থেকে কনেকর্তা সিঁড়ির ফাঁক গলে নীচে পরে গেলেন, হাত উপরে নীচে কনেকর্তা ঝুলছেন।

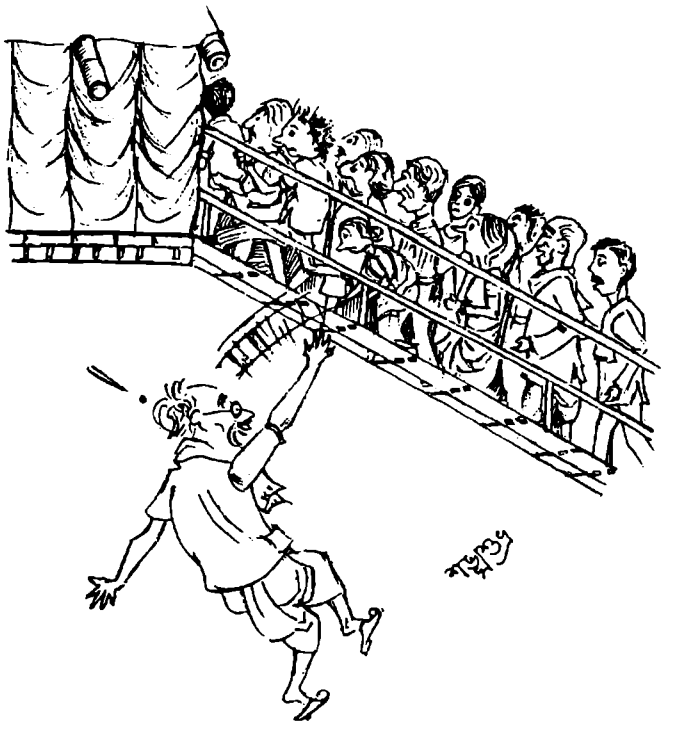

এমন সময় এক মোটামতন ভদ্রলোক ওই ফাঁক দিয়ে যেতে গিয়ে ভুলবশত দিলেন হাত মাড়িয়ে ব্যাস, তারপর তার খবর আর জানা গেল না কারণ, এদিকে অলরেডি লাইন লেগে গেছে, এক একটা পরিবার এক একটা রো, সব চেয়ার ধরে অধিকৃত সম্পত্তি। পাশের ভদ্রলোক আর থাকতে না পেরে বলেই বসলেন 'দাদা আইসক্রিমটা একটু দাঁড়িয়ে খান না।' লোক উঠতে না উঠতে এদিকে একজন একটা রোয়ের একপ্রান্তে রুমাল রেখে আরেক প্রান্তে বসে পড়লেন অর্থাৎ সারা রো তার অধিকারে। চারদিকে এত ডামাডোলের মধ্যে কোনরকমে তিনজনে জায়গা করে বসে পড়লাম। পরিবেশন আরম্ভ হল, খাচ্ছি আস্তে আস্তে খাওয়া শেষ হল, এবার সবশেষে পানের আগমন। আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না পান হাতে পেলেই বাবা কেন ভাবুক দাদার মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে, কবে তার কোন মাসি না পিসি তাকে পান খাইয়ে ছিল তার সঙ্গে হাতে ধরা পানের চুলচেরা বিশ্লেষণে লেগে যায়। তখন নাকি তাদের রূপোর বাটা ছিল ইত্যাদি, ইত্যাদি, প্রতিবার একই কথা, কান পচে গেছে শুনতে শুনতে— বিয়েবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় সত্যি বলতে কী একটু দুঃখই হয়। কিন্তু তখন বাবার মুখে প্রসন্নতার হাসি!

আমার ছোট্ট পুতুল

দিৎসা উপাধ্যায়

গ্রাহক সংখ্যা : ৪৬৫৪, বয়স : ৭

আমার ছোট্ট পুতুল টিনা।
মাথায় দেয় হেনা,
তার গা ভরতি গয়না।
রাত দিন করে বায়না।
যাবে চিড়িয়াখানা
দেখতে শুধু হায়না।

ছুটির মজা

শ্রীজিতা পাল

গ্রাহক সংখ্যা : ৪৩০২, বয়স : ১৩

ঝল্‌মলে রোদ্দুরে ফুরফুরে হাওয়া
লালনীল ঘুড়িটার সাথে উড়ে যাওয়া
টুলটুলে দিঘিজলে হাঁস আর সাপ
বারোটার হাত ধরে সেই জলে ঝাঁপ
দুপুরের উত্তাপে গায়েতে আগুন
চুরি করা কাঁচা আম, সাথে থাকে নুন।
হই-চই চিৎকারে বিকেলের বেলা
সব্বাই মিলে হবে জোর খো-খো খেলা
পূর্ণিমা রাত্তিরে চাঁদনির আলো
ছাদে বসে দেখতে লাগবে তো ভালো।

শাঁকচুন্নির রাগ

রিখিয়া ভুক্ত

গ্রাহক সংখ্যা : ৪০৯৫, বয়স : ৭

একটা তেঁতুল গাছে একটা শাঁকচুন্নি থাকত। সে একদিন গাছে বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে তেঁতুল খাচ্ছে। এমন সময় সেখান দিয়ে একটা লোক যাচ্ছিল। শাঁকচুন্নি তাকে জিজ্ঞেস করল, 'এঁই তুঁই কেঁরে?'

লোকটা বলল, 'আমি লোক'।

শাঁকচুন্নি বলল, 'তুঁই তেঁতুল খাঁবি?'

সে বলল, 'হ্যাঁ খাব'।

শাঁকচুন্নি তখন গাছ থেকে একটা তেঁতুল ফেলে দিয়ে বলল, 'এঁটা খেঁয়ে নেঁ'।

লোকটা বলল, 'খাচ্ছি'।

কিন্তু তেঁতুলটা খুব টক ছিল বলে সে সেটা খেয়েই ও-য়া-ক করে বমি করে দিল। এদিকে সেই তেঁতুল গাছটার পাশেই একটা বটগাছের গর্তে কয়েকটা কাঠবেড়ালি থাকত। তাদের মধ্যে একজন বেরিয়ে এসে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কেন বমি করেছিস রে? আমাদের গন্ধ লাগছে'।

সে বলল, 'ওই শাঁকচুন্নিটা আমাকে বেছে বেছে পচা তেঁতুল দিয়েছে বলেই তো আমি বমি করেছি'।

কাঠবেড়ালি বলল, 'কোন শাঁকচুন্নিটা'?

লোকটা 'ওই যে', বলে উপর দিকে আঙুল দেখাল, শাঁকচুন্নিকে দেখতে পেয়েই কাঠবেড়ালি ভয়ে এক লাফে ওর গর্তে ঢুকে গেল। আর শাঁকচুন্নিকে দোষ দিয়েছে বলে শাঁকচুন্নি গাছ থেকে নেমে এসে রেগে মেগে লোকটার ঘাড় ধরে রাম ঝাঁকানি দিল। লোকটা একদম মুচ্ছো গেল।

তারপর শাঁকচুন্নিটা আবার গাছে ফিরে এসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে তেঁতুল খেতে লাগল।

শব্দ জব্দ

সূত্র

পাশাপাশি

১। প্রোফেসর শঙ্কু আবিষ্কৃত ক্ষুধাহরণ বড়ি

৫। সত্যজিৎ রায় বিদেশি লেখদের গল্প অনুবাদ করেছেন, তার মধ্যে এটাও একটা

৭। 'অ্যানাইহিলিন' ট্যাবলেট আবিষ্কারের কথা আছে 'প্রোফেসর শঙ্কু ও — রহস্য' গল্পে

৯। ফেলুদাকাহিনির এক সাহেব, যিনি লখনউ-এর নবাবের রুবি লুঠ করেন

১১। এ 'বাবু'ই তো ফেলুদাকাহিনির 'জটায়ু'

১৩। ফেলুদার স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়, আর এর স্রষ্টা 'জটায়ু'। 'রুদ্র' ডিটেকটিভ

১৫। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের স্মৃতির উদ্দেশে জটায়ুর উৎসর্গীকৃত বই 'আণবিক—'

১৮। 'নেপোলিয়নের চিঠি'-তে অচিন্ত্য হালদারের থিয়েটার, যেন 'নতুন নাট্যশালা'।

উপর-নীচ

২। 'স্বপ্নদ্বীপ' গল্পে প্রোফেসর শঙ্কু আবিষ্কৃত 'চায়ের বড়ি'

৩। 'অ্যানাইহিলিন' পিস্তল আবিষ্কারের কথা আছে 'প্রোফেসর শঙ্কু ও — এফ. ও' গল্পে

৪। শঙ্কুর পোষা বুদ্ধিমান এই পাখিটির নাম 'কর্ভাস'

৬। 'হত্যাপুরী'-তে রূপচাঁদ সিং-এর হত্যাকারী

৭। 'ঘ্রাণশক্তি বাড়ানোর ওষুধ'-এর কথা আছে 'প্রোফেসর শঙ্কু ও —' গল্পে

৮। মুখের কথা বা প্রতিশ্রুতি, ফেলুদা যা সর্বদাই রাখতেন

৯। এটা ভেদ করতে ফেলুদা তো সিদ্ধহস্ত

১০। 'নয়ন রহস্য'-তে নয়নের সামনে যা ঘোরাঘুরি করত

১২। তদন্তের কাজে ফেলুদা বিদেশেও পা রেখেছেন, এমনই এক শহর

১৪। ইমলিবাবার সাপ নিয়ে সত্যজিতের গল্প

১৬। 'বাদশাহী আংটি'-তে চিড়িয়াখানার মালিক '— বিহারীবাবু'

১৭। 'সমাদ্দারের চাবি'-তে রাধারমনবাবু প্রতিবেশীর সঙ্গে যা বিনিময় করতেন

১	২		৩		৪	■	■
■		■		■	৫	৬	
৭			■	৮	■		■
	■	■	৯				১০
১১	১২			■	■	■	
■		■		■	১৩	১৪	
১৫		১৬	■	১৭	■		■
■	■	১৮					

স্নেহাশিস কুমার

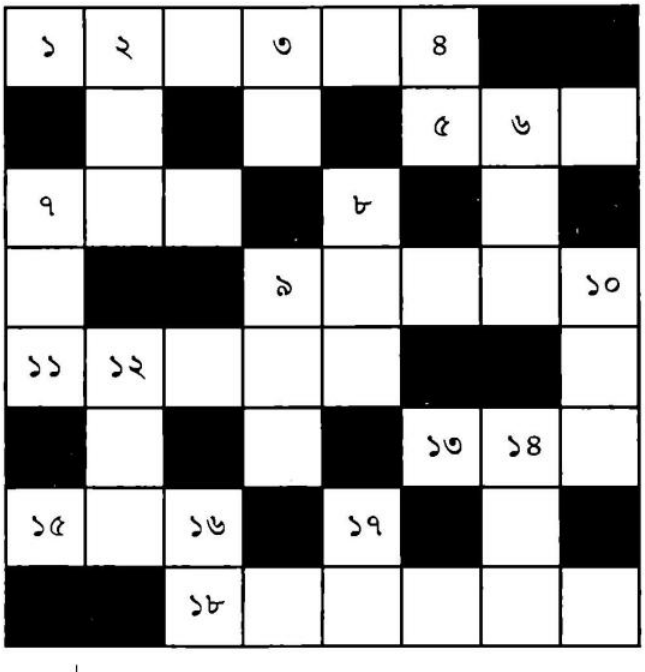

সমাধান

পাশাপাশি : ১। বটিকাইন্ডিকা ৫। কবিতা ৭। গোলক ৯। রবার্টসন ১১। লালমোহন। ১৩ প্রখর ১৫। দানব ১৮। নবরঙ্গমঞ্চ

উপর-নীচ : ২ টিপিল ৩। ইউ ৪ কাক ৬। বিলাস ৭। গোরিলা ৮। জবান ৯। রহস্য ১০। নম্বর ১২। লন্ডন ১৪। খগম ১৬। বন ১৭। সুর

ধাঁধা

জটা পাগলার সমস্যা

পটলা, হাবু আর ট্যাপাকে নিয়ে সার্কাস দেখতে গেস্‌লাম। সার্কাস থেকে বেরিয়ে হাবু বলল, 'জটুদা, তোমার বন্ধু কেবলরামের কী একটা সার্কাস ছিল জানি?' আমি বললাম, 'গুবরেপোকা আর মাকড়শার। ট্যাপা হেসে বলল, 'কটা গুবরে, কটা মাকড়শা?' আমি বললাম, 'হুঁ হুঁ বাবা, একটু হেয়ালি করি, কী বলিস? গুবরে আর মাকড়শা মিলিয়ে মোট সংখ্যা হল আট আর ওদের পায়ের সংখ্যা হল ৫৪। বল তো কটা গুবরে আর কটা মাকড়শা ছিল?' পটলা বলল, 'গুবরে আর মাকড়শাদের কটা যেন পা থাকে? দুটো নাকি চারটে?' আমি বললাম, 'সেটাও বলব না।' পটলা, হাবু আর ট্যাপা মাথা চুলকোচ্ছে, সন্দেশীরা কি ওদের সাহায্য করতে পারবে?

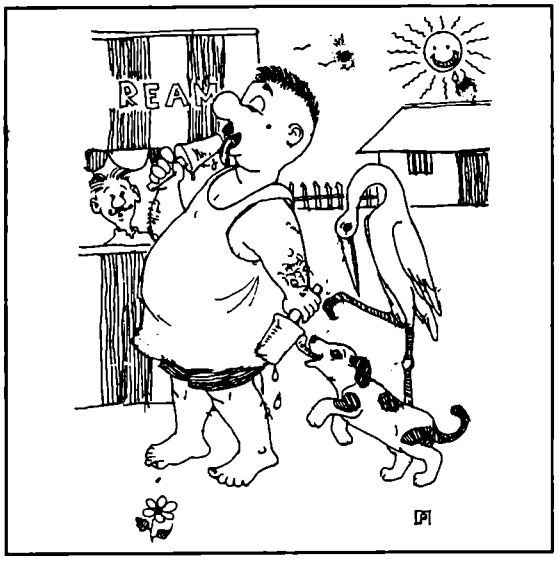

দাশু বলল, 'হবা মনকে আমরা।'
প্রোফেসর বললেন, 'ভেজির আলস উডিটি'।

মে সংখ্যার ধাঁধার উত্তর : প্রথম থলি ২২, দ্বিতীয় থলি ১৪, তৃতীয় থলি ১২

এ সংখ্যার উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ ৩১ জুলাই

ভুল সংশোধন

আর বোলো না কী কাণ্ড! গত সংখ্যার কুইজের গোড়াতেই গলদ। শিরোনামের 'শ্মশ্রু-গুম্ফ' হয়ে গেল কিনা 'শ্বশ্রু-গুম্ফ'!! আর শ্বশ্রূর গুম্ফ হলে তো এক্কেবারে কেলেঙ্কারি! এখন মুনশিজির 'পাঁচ কথার প্যাঁচ'-এ ঢুকে না পড়লেই বাঁচি।

সন্দেশ পোস্টার

স্পাইডারম্যান ও ড. অক্টোপাস। 'স্পাইডারম্যান টু'র অ্যাডভান্স পোস্টার

সৃষ্টিকর্তা স্ট্যান লি

পরিচালক স্যাম রেমি

'সন্দেশ পোস্টার' আবার চালু হল 'স্পাইডারম্যান টু'-কে দিয়ে। ছবিটি হৈ হৈ করে সারা পৃথিবী জুড়ে রিলিজ করছে এই জুলাই মাসেই। তোমরা, যারা 'স্পাইডারম্যান' এর কমিক্স পড়েছ, বা প্রথম ছবিটি দেখেছ, তাদের বোধহয় আর বলে দিতে হবে না যে অ্যামেরিকার এই বিখ্যাত সুপারহিরোটি কে!

২০০১ সালে সোনি পিকচার্স এবং বিখ্যাত কমিক্স সংস্থা 'মার্ভেল' যখন এক জোট হয়ে 'স্পাইডারম্যান' করা স্থির করে তখন নির্বাচিত হন পরিচালক স্যাম রেমি। এই 'মার্ভেল' কমিক্সের পাতাতেই 'স্পাইডারম্যান'-এর জন্ম ১৯৬৩ সালে। সৃষ্টিকর্তা সেই কোম্পানির কর্ণধার স্ট্যান লি।

পরের বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে 'স্পাইডারম্যান' রিলিজ করে এবং প্রথম দিনেই ছবিটি ৪৩.৬ মিলিয়ন ডলার উপার্জন করে 'গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস'-এ স্থান পায়। দিন তিনেকের মধ্যেই প্রযোজকের ঘরে চলে আসে ১০০ মিলিয়ন ডলার। অ্যামেরিকার চলচ্চিত্র ইতিহাসে 'স্পাইডারম্যান'-এর আগে কোনও ছবি এত চটজলদি এত টাকা রোজগার করেনি।

এই অভাবনীয় সাফল্যের পর দু নম্বর ছবিটির পরিচালনার দায়িত্ব যে স্যাম রেমির উপরেই পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কী!

'স্পাইডারম্যান টু'র শুটিং শুরু হয় ২০০৩-এর এপ্রিল মাসে। প্রথম ছবিতে 'স্পাইডারম্যান' লড়েছিল ভয়ঙ্কর ভিলেন গ্রিন গবলিনের সঙ্গে। আর এই ছবির খলনায়ক ড. অক্টোপাস। যদিও কমিক বইতে ছিল ঠিক উল্টো। 'স্পাইডারম্যান'-এর তিন নম্বর সংখ্যাতেই ড. অক্টোপাস হাজির (জুলাই ১৯৬৩)। গ্রিন গবলিনের আবির্ভাব চোদ্দ নম্বর সংখ্যায়।

প্রথম 'স্পাইডারম্যান' তোলার সময় এক মজার ঘটনা ঘটে। স্পাইডারম্যানের সুপার হিরো পোশাকের অনেকগুলো কপি তৈরি করা হয়েছিল। যার এক-একটার দাম প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। শুটিং চলাকালীন খোদ স্টুডিও থেকে চারটে পোশাক চুরি হয়ে যায়। তার পরদিনই পরিবেশক কোলম্বিয়া পিকচার্সের তরফ থেকে কাগজে তড়িঘড়ি বিজ্ঞাপন— পোশাক-সমেত চোরকে পাকড়াও করলে সাড়ে বারো লাখ টাকা পুরস্কার। বলাই বাহুল্য, সে চোর আজও ধরা পড়েনি।

কমিক বইতে ড. অক্টোপাসের প্রথম আবির্ভাব। জুলাই ১৯৬৩

গ্রিন গবলিনের প্রথম আবির্ভাব। জুলাই ১৯৬৪

SPIDER-MAN 2
কৃতজ্ঞতা : সোনি পিকচার্স। কোলাম্বিয়া ট্রাইস্টার
সন্দেশ পোস্টার

Regd. NO. WB/SC–102 R.N.I. No. 12007/64 Sandesh July 2004 Rs. 12

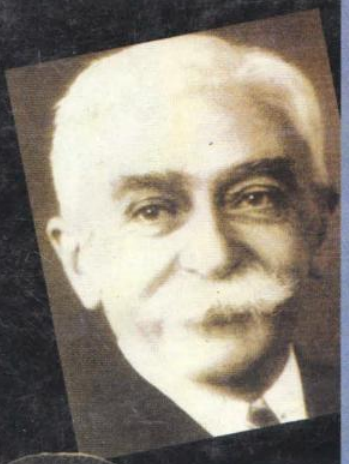

আগামী সংখ্যায়

অলিম্পিক